DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

DEPT. OF HISTORY

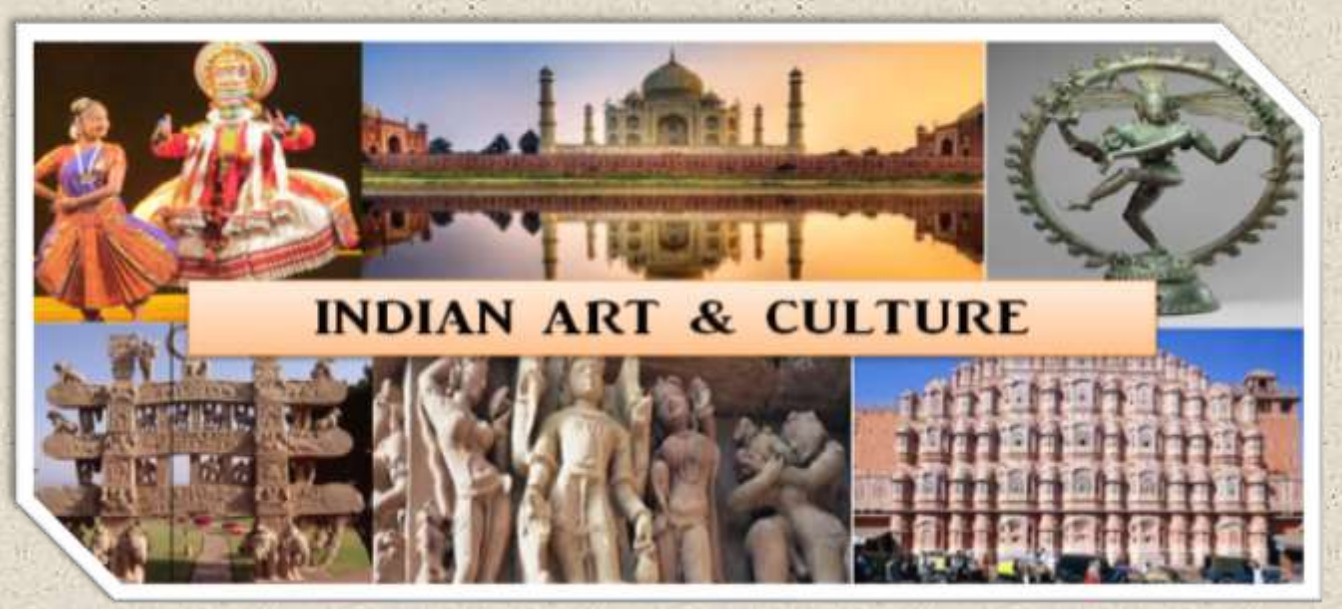

STUDY MATERIAL FOR

4th SEMESTER HISTORY HONS. STUDENTS

SUBJECT – HISTORY (HONS.)

PAPER- SEC-B-2

Art appreciation: an introduction to Indian art

UPLOADED FOR D.C.H. COLLEGE 4th SEM
HISTORY HONS. STUDENTS IN LOCKDOWN PERIOD

HISTORY (HONS.)
4th Sem: SEC-B-2
Art-Appreciation: an Introduction to Indian Art

(1)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

STUDY MATERIAL

প্রাচীন ও সুলতানী যুগের শিল্পকলা

সূচনা

শিল্প-সংস্কৃতির গুরুত্ব

মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে শিল্প-সংস্কৃতি গুরুত্ব পেয়ে আসছে। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ নানান পর্বত ও গুহাগাত্রে রচনা করে গেছে শিল্পকলা। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর আজও রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার কিছু শিল্প-নিদর্শন উৎখননের ফলে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী ও পুরুষ মূর্তি, সীলের ওপর অঙ্কিত পশুর চিত্র ও নানান আকারের খেলনা। প্রতিটি বস্তুই শিল্পীর পরিশীলিত রুচির ছাপ বহন করে। তাছাড়া শস্যাগার, স্নানাগারসহ বিভিন্ন আয়তনের গৃহ ও রাস্তাঘাট ছিল সমকালীন স্থাপত্যকলার নিদর্শন। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তীকাল থেকে প্রায় মৌর্যযুগ পর্যন্ত শিল্প সৃষ্টির কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পর্বেই ভারতে আর্যদের আগমন ঘটেছে, ঋকবৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে উন্নতমানের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এই দেড় হাজার বছরের অধিককালের শিল্প সৃষ্টির কোনো স্বাক্ষর আমাদের নজরে আসেনি। বাস্তবে এটি কোনো শূন্যতা নয়। কারণ শিল্প সৃষ্টির একটি ধারাবাহিকতা না থাকলে মৌর্য শিল্পের এত সমৃদ্ধি সম্ভব হত না। শিল্প সৃষ্টি নিশ্চয় হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি হয়ত কালের প্রকোপে বিনষ্ট হয়ে গেছে অথবা আজও আবিষ্কারের অপেক্ষায় থেকে গেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতীয় শিল্পের সূচনা ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে ঘিরে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য কোনো ধর্মমতেই মূর্তিপূজা স্বীকৃত না থাকায় একদিকে যেমন মন্দিরের প্রয়োজন হয়নি অপরদিকে ধর্ম-কেন্দ্রিক শিল্পের বিকাশও ঘটেনি। এখানে অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের বড়ো অংশই শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ। তা ছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চাওয়াপাওয়ার সার্থক প্রতিফলন।

সিন্ধু সভ্যতা

বৈদিক যুগে শিল্প নিদর্শনের অনুপস্থিতি

ধর্মনিরপেক্ষ শিল্প

১. মৌর্যযুগে শিল্প

পাটলিপুত্রের প্রাসাদ

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রকৃত সূচনা মৌর্যযুগ থেকে। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বৃত্তান্তে পাটলিপুত্র নগরীর সুরম্য প্রাসাদগুলির উল্লেখ আছে। ফা-হিয়েন মন্তব্য করেছিলেন, এগুলি যেন কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়, সবই দানবের কীর্তি। মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্তে চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা আছে। প্রাসাদটি ছিল কাঠের নির্মিত। প্রাসাদের থামগুলিতে সোনা-রূপার পাত শোভা পেত। পাটলিপুত্র দুর্গের কাঠের তৈরি প্রাচীরে ছিল প্রচুর সিংহদরজা ও পাঁচ শতাধিক তোরণ। চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদটি আজ বিলুপ্ত। কিন্তু বর্তমান পাটনা শহরের অদূরে কুমরাহারে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত এক বিশাল দরবার কক্ষ অপরূপ স্থাপত্যকলার স্বাক্ষর বহন করে। দরবারের স্তম্ভগুলি মসৃণ পাথরের তৈরি।

কুমরাহার

মৌর্য স্থাপত্যকলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট স্তূপ। কোনো পবিত্র স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে বৌদ্ধ ও জৈনরা ইঁট ও পাথর দিয়ে স্তূপ নির্মাণ করত। ভারত ও আফগানিস্তান অঞ্চলে অশোক প্রচুর সংখ্যায় স্তূপ নির্মাণ করেন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ এগুলির মধ্যে প্রায় চারশোটি দেখতে পান। বর্তমানে এগুলির মধ্যে সামান্যই অবশিষ্ট আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূপালের অদূরে অবস্থিত সাঁচীর স্তূপ। এটি প্রথমতনে একশো বাইশ ও উচ্চতায় আটাত্তর ফুট। চারটি তোরণদ্বারসহ স্তূপটি এগারো ফুট উচ্চতায় বেদিং দিয়ে ঘেরা। পরবর্তীকালে মূল স্তূপটির অনেক সংস্কার হয়েছে। অনুরূপ একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে বারাণসীর নিকট সারনাথে।

স্তূপ

সাঁচী

অশোকের রাজত্বকালে সাঁচী ও সারনাথে নির্মিত হয়েছিল চৈত্যগৃহ। গয়ার নিকটে বারাবর পর্বতে আবিষ্কৃত চৈত্যগৃহটিও মৌর্য যুগেই নির্মিত। বারাবর ও নাগার্জুনী পর্বতে পাহাড় কেটে গুহা নির্মিত হয়েছিল। এগুলি বিহার বা সঙ্ঘারাম হিসাবে আজীবিক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য মৌর্যরাজ অশোক ও তাঁর পৌত্র দশরথ নির্মাণ করেন। গুহাগুলি প্রার্থনাকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হত। গুহাগাত্র ছিল মসৃণ ও চকচকে।

সারনাথ

চৈত্য ও সঙ্ঘারাম

বারাবর ও নাগার্জুনী পর্বত

মৌর্য ভাস্কর্যের অসাধারণ নিদর্শন পাথরে নির্মিত স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষে শোভিত পশুমূর্তি। অশোকের রাজত্বকালে তিরিশ থেকে চল্লিশটি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সাঁচী ও সারনাথ ছাড়াও স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে বৈশালীর নিকট বাখিরা, চম্পারণের নিকট রামপূর্বা ও লোরিয়া নন্দনগড়, কপিলাবস্তুর নিকট রুম্মিনীদেই ও উত্তরপ্রদেশের সাঙ্কাশ্যবাসের নিকট সঙ্কিস্য অঞ্চলে। স্তম্ভের দুটি অংশ ছিল। একটি দণ্ড অপরটি শীর্ষ। স্তম্ভগুলি একশিলা অর্থাৎ এক খণ্ড পাথরে নির্মিত। গোলাকার স্তম্ভ নীচ থেকে ওপরে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। শীর্ষভাগের তিনটি অংশ ছিল-ওল্টানো পদ্ম, মঞ্চ ও মঞ্চের ওপর পশুমূর্তি। প্রথম দুটি অংশে দেখা যায় অপরূপ অলঙ্করণ। সবার ওপরে পশুমূর্তিগুলি ছিল ভাস্কর্য শিল্পের অসাধারণ সৃষ্টি। পশুমূর্তিগুলি সাধারণত হত বৃষ, হস্তী ও সিংহের। সাঁচী ও সারনাথে দেখা যায় চারটি সিংহ পিঠে পিঠ দিয়ে উপবিষ্ট। পশুমূর্তিগুলিকে গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। শিল্প-সমালোচকগণ পশুমূর্তিগুলির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে হস্তীমূর্তি অশোকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতীক এবং সিংহমূর্তি আড়ম্বর ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

স্তম্ভ

দণ্ড ও শীর্ষ

পশুমূর্তি-বৃষ, হস্তী ও সিংহ

পশুমূর্তির ব্যাখ্যা

মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে বিদেশী প্রভাব কতটা কাজ করেছে এ প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। জন মার্শাল মনে করেন, পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদ ও সারনাথের স্তম্ভের ওপর পারসিক ও গ্রীক শিল্পরীতির প্রভাব কাজ করেছে। প্রথমটি পারস্য-সম্রাট প্রথম দরায়ুসের আবাদান প্রাসাদের অনুকরণ। দ্বিতীয়টিও নির্মিত পারসিক ভাস্কর্যের আদলে। আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্যদেশ অভিযানের ফলে গ্রীক ও পারসিক শিল্পরীতির মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে। অশোক এই শিল্প আদর্শে প্রভাবিত গ্রাকট্রিয় গ্রীক শিল্পীদের ভারতে আমন্ত্রণ জানান। তারাই ছিল মৌর্য ভাস্কর্যের স্রষ্টা। অপরদিকে হ্যাভেল ও কিছু ভারতীয় শিল্প-সমালোচক বিদেশী প্রভাবের তত্ত্ব মানেন না। হ্যাভেল মনে করেন মৌর্য স্থাপত্য আর্য-অনার্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণ। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে ভারতীয় শিল্পরীতিই মধ্যএশিয়া ও চীনের শিল্পরীতিকে প্রভাবিত করেছিল। মৌর্য স্তম্ভের ওপর পারসিক প্রভাব থাকলেও উভয়ের পার্থক্যগুলিও প্রকট। মৌর্য স্তম্ভগুলির স্বাতন্ত্র্য ছিল যা তাদের আকার ও পরিকল্পনায় প্রতিফলিত। পারসিক স্তম্ভের একটি ভিত্তিমূল ছিল যা অশোকের স্তম্ভের ছিল না। পারসিক স্তম্ভের দণ্ড অনেক পাথরের সমষ্টি, কিন্তু অশোকের স্তম্ভগুলি একশিলা। উভয় স্তম্ভের শীর্ষের আয়তন ও পরিকল্পনার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

বিদেশী প্রভাব সংক্রান্ত বিতর্ক

জন মার্শাল—পারসিক ও গ্রীক প্রভাব

হ্যাভেল—আর্য-অনার্য সংমিশ্রণ

মৌর্য ও পারসিক স্তম্ভের পার্থক্য

শিল্প-বিশেষজ্ঞ নীহাররঞ্জন রায় মৌর্য শিল্পে ভারতীয়দের অবদানের ওপর জোর দিয়েছেন। আনন্দ কুমারস্বামী মন্তব্য করেছেন, ভারত ও পারস্য উভয়েই ছিল পশ্চিম এশিয়ার সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশীদার।

মৌর্য স্থাপত্য-ভাস্কর্যের দরবারী চরিত্র

শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন মৌর্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য ছিল দরবারী চরিত্রের। এর উদ্দেশ্য ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বর প্রদর্শন করে মৌর্যরাজদের প্রতি প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও সমীহ আদায় করা। বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে এই শিল্পকর্মের কোনো সংযোগ ছিল না। মৌর্য সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে এই শিল্পকর্মের সমৃদ্ধি ও তার পতনের সঙ্গে এর পতনের যোগাযোগ ছিল। ভারতের পরবর্তী শিল্পরীতির সঙ্গে মৌর্য শিল্পের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

২. শুঙ্গ ও কাণ্বযুগে শিল্প

মৌর্যোত্তর যুগে শুঙ্গ ও কাণ্ব শাসনকালের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ না থাকলেও শিল্পকলার উৎকর্ষতার দিক থেকে এই যুগের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। মৌর্যযুগের

পশ্চিম ও পূর্ব ভারত

মতো এ যুগেও পাহাড়ের গুহায় চৈত্যগৃহ ও বিহার নির্মাণ করা হয়। পশ্চিমভারতে অজন্তা, ইলোরা, নাসিক, জুন্নার ও বেদসায় এবং পূর্বভারতে ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরিতে এ যুগে নির্মিত চৈত্যগৃহ আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পগুণের বিচারে মৌর্যযুগের তুলনায় এগুলি ছিল উন্নতমানের। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুঙ্গরাজদের শাসনকালে

স্তূপ ও তোরণ

ভারহুতে ইঁটের তৈরি একটি স্তূপ ও পাথরের তৈরি রেলিং ও তোরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। শুঙ্গযুগে নির্মিত স্তূপ ও তোরণ আবিষ্কৃত হয়েছে কৌশাম্বী, ভিটা, বেসনগর, গড়হোয়া, আমিন প্রভৃতি স্থানে। বুদ্ধগয়ায় গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের স্থলে এযুগে একটি রেলিং নির্মিত হয়। শুঙ্গ ও কাণ্ব যুগে নির্মিত রেলিং ও তোরণগাত্রে গৌতম বুদ্ধের জীবনের

প্রতীকের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের জীবন

বিভিন্ন দৃশ্য প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলি থেকে সমকালীন মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি বিশ্বস্ত ছবি ফুটে ওঠে।

রেলিং ও তোরণগাত্রে জাতক ও গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনী

অশোকের রাজত্বকালে সাঁচীতে ইঁটের তৈরি যে স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল শুঙ্গ-কাণ্ব যুগে তার সঙ্গে পাথরের আস্তরণ যুক্ত হয়। এর ফলে স্তূপের আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যায়। একই সঙ্গে স্তূপের চারপাশে রেলিং ও তোরণও নির্মিত হয়। এদের গায়ে জাতকের কাহিনী ও গৌতম বুদ্ধের জীবন নিয়ে উন্নতমানের ভাস্কর্য রচিত হয়। মৌর্যযুগের দরবারী

মানুষের প্রাত্যহিক জীবন প্রতিফলিত

শিল্পের স্থলে মৌর্যোত্তর যুগে স্থাপত্য-ভাস্কর্যে সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার আন্তরিক প্রতিফলন যেন এই শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে।

৩. স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পের তিন ঘরানা

মৌর্য ও শুঙ্গ-কাণ্ব যুগ থেকে শুরু করে গুপ্তযুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তিনটি ঘরানার উন্মেষ ঘটে। উৎপত্তি স্থল অনুযায়ী এগুলি হল গান্ধার শিল্প, মথুরা শিল্প ও অমরাবতী বা বেঙ্গী শিল্প। এই শিল্পরীতিগুলিই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে গুপ্তযুগে ধ্রুপদী শিল্পের মর্যাদা লাভ করে।

গান্ধার-পারসিক, শক, পহ্লব, কুষাণজাতির বাস

(ক) গান্ধার শিল্প ঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতের প্রবেশপথে অবস্থিত হওয়ায় গান্ধার অঞ্চলে পারসিক, ইন্দো-গ্রীক থেকে শুরু করে শক, পহ্লব ও কুষাণরা বসতি

স্থাপন করে। ইন্দো-গ্রীক রাজ মিনান্দার, শকরাজ ময়েস ও কুষাণরাজ কণিষ্ক সকলেই বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার বৌদ্ধ সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখান থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে। সেখানে বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের এক সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণ ঘটে। গান্ধারের বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এই প্রভাব সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন গান্ধার শিল্পকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্প আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। কারণ এই শিল্প যখন উন্নতির শীর্ষে তার বহু পূর্বেই গ্রীক শাসনের অবসান হয়েছে। এই শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে আগত শক ও কুষাণ রাজগণ। শিল্পরীতির দিক থেকে গান্ধার শিল্প গ্রীক হলেও এর ওপর পারসিক ও শক প্রভাব কাজ করেছে। কিন্তু শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় ও তার প্রধান অবলম্বন ছিল বৌদ্ধ ধর্ম।

গ্রীক-বৌদ্ধ প্রভাব

গ্রীক প্রভাব অস্বীকার

শিল্পরীতি গ্রীক, বিষয়বস্তু ভারতীয়, অবলম্বন বৌদ্ধ

গান্ধার শিল্পের নিদর্শন যেসব স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আফগানিস্তানের অন্তর্গত জালালাবাদ, হাদ্দা ও বামিয়ান, সোয়াত উপত্যকা, তক্ষশিলা, বাল হিস্‌সার; চারসাদ্দা, ঘজ-চেরির মতো প্রত্নস্থলে। উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলির আনুমানিক সময়কাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী অর্থাৎ ইন্দো-গ্রীক শাসনের অবসান ও কুষাণদের ক্ষমতালাভের মধ্যবর্তীকালে। তবে কুষাণ শাসনকালে বিশেষ করে কণিষ্কের সময় গান্ধার শিল্প সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছায়। স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ওপর এর প্রভাব প্রায় খ্রীঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। গান্ধার শিল্পের প্রথম পর্বে ভাস্করগণ সোয়াত ও বুনেরের শিস্ট পাথর মূর্তি নির্মাণের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করত। দ্বিতীয় পর্বের প্রধান উপাদান ছিল স্টাকো বা চূণ-বালি, এটেল ও পোড়া মাটি। এগুলিকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হত। এই নরম উপাদান ব্যবহারের ফলে মূর্তির দেহসৌষ্ঠব অনেক কমনীয় ও লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।

শিল্প-নিদর্শন প্রাপ্তির স্থান

খ্রীঃ পূঃ প্রথম থেকে খ্রীঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী

কুষাণযুগে সমৃদ্ধি

শিল্প-উপাদান

তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত না হলেও অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে গান্ধার শিল্পীরাই গৌতম বুদ্ধের মূর্তি প্রথম নির্মাণ করেন। কারণ প্রথম বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায় খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে গান্ধার ও মথুরায়। এই সময়টি ছিল কুষাণদের রাজত্বকাল। এর পর সুদীর্ঘ চার শতাব্দী ধরে গান্ধার শিল্পীগণ বৌদ্ধগ্রন্থাদি ও বৌদ্ধ লোকগাথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গৌতম বুদ্ধের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার ভাস্কর্য-রূপ দিয়েছে। জাতকের গল্পের চেয়েও গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী শিল্পীদের বেশি আকৃষ্ট করেছিল। গান্ধার অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি ছড়িয়ে ছিল। এদের মধ্যে পেশোয়ার, তখ্‌ত-ই-বাহি, জামালগড়ি, তক্ষশিলা, মানিকিয়ালা প্রভৃতি স্থানে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। ফা-হিয়েন যখন গান্ধারে যান তখন তা ছিল সমৃদ্ধশালী, কিন্তু হিউয়েন সাঙের পরিভ্রমণের সময় গান্ধার ছিল জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

প্রথম বুদ্ধমূর্তি গান্ধার শিল্পীদের কীর্তি

জাতকের গল্পের চেয়েও গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনী শিল্পীদের আকর্ষণ

শিল্প-নিদর্শনের প্রাপ্তিস্থান

আনন্দ কুমারস্বামীর মতো শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বহিরঙ্গে বিদেশী প্রভাব থাকলেও গান্ধারের বুদ্ধমূর্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে চলেছে। এখানে গৌতম বুদ্ধকে গ্রীক-রোমান দেবতা বলে মনে হতে পারে। কারণ মূর্তির গায়ের আবরণ ছিল পুরু, মাথায় কোঁচকানো চুল, কখনও কখনও গোঁফ ছিল। শিরস্ত্রাণ, দৈহিক গঠন ও অভিব্যক্তি প্রভৃতির মধ্যেও বিদেশী প্রভাব ছিল স্পষ্ট। কিন্তু মূর্তিগুলি ছিল ভারতীয় ভাবাদর্শ-সম্মত। একজন ভারতীয় মহাপুরুষের সব লক্ষণ যেন মূর্তিগুলিতে ফুটে উঠেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ দেবলা মিত্রের ভাষায় বহিরঙ্গে বিদেশী হলেও মূর্তিগুলির আত্মা ভারতীয়ই।

বিদেশী-ভারতীয় সংমিশ্রণ

(খ) মথুরা শিল্প ঃ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে উত্তর ভারতের মথুরা নগরী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিভিন্ন বাণিজ্য পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় মথুরা অর্থনৈতিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ ছিল। মথুরায় শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল অতি

বিশেজ্ঞদের অভিমত

মথুরা সমৃদ্ধ নগরী

মথুরা শিল্পের ভারতীয়ত্ব

প্রাচীনকালে। কিন্তু কুষাণ যুগে তা উৎকর্ষতা লাভ করে। গান্ধার শিল্পশৈলীতে বিদেশী প্রভাব থাকলেও তারই সমসাময়িক মথুরা শিল্প ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। ভারতে আর্য-অনার্য শিল্প সংমিশ্রণের যে ধারা প্রচলিত ছিল মথুরা শিল্পে তাই পরিণতি লাভ করে বলে শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

গৌতম বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তীর্থঙ্কর ও যক্ষমূর্তি

বোধিসত্ত্বের দুটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য

প্রায় দেড়শোটি ভাস্কর্য-নিদর্শন মথুরা অঞ্চলসহ সারনাথ, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বীতেও পাওয়া গেছে। গৌতম বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি ছাড়াও জৈন তীর্থঙ্কর ও যক্ষ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য হল বিশালতা ও স্থূলতা। মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কণিষ্কের রাজত্বকালে নির্মিত দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মূর্তি। মূর্তিটি উচ্চতায় দশ ফুট ও প্রস্থে তিন ফুট। বোধিসত্ত্বের পা দৃঢ়ভাবে মাটিতে রক্ষিত। দুপায়ের মাঝখানে একটি সিংহমূর্তি লক্ষণীয়। মূর্তির ডান হাতে অভয় মুদ্রা ও বাঁ হাত নিতম্বের ওপর স্থাপিত। কণিষ্কের শাসনকালে নির্মিত বোধিসত্ত্বের অপর একটি মূর্তি কৌশাম্বীতে পাওয়া গেছে। প্রথম মূর্তিটির সঙ্গে দ্বিতীয় মূর্তিটির অনেক সাদৃশ্য থাকলেও পদযুগলের মাঝখানের সিংহটি দ্বিতীয়টিতে অনুপস্থিত। মথুরা শিল্পে বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলির প্রতিটি দণ্ডায়মান, আকৃতিতে গোল, মস্তক মুণ্ডিত, ললাট ওড়নাবিহীন, দেহের উপরাংশ কিছুটা আবৃত, নিম্নাঙ্গ বস্ত্রশোভিত ও কোমর-বন্ধনীর দ্বারা বাঁধা। ডান কাঁধ অনাবৃত, ভাজ করা বস্ত্র বাম কাঁধের ওপর বিন্যস্ত। ডান হাতে অভয় মুদ্রার ভঙ্গি, বাম হাত উরুর ওপর রাখা। মূর্তিগুলির চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে পার্থিবতার ছাপ স্পষ্ট। গৌতম বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি ছাড়াও মথুরা শিল্পে মহাবীরসহ অন্যান্য তীর্থঙ্করদের নগ্ন মূর্তিও গুরুত্ব পেয়েছে। আকার ও আয়তনের দিক থেকে এগুলির সঙ্গে বুদ্ধ মূর্তির সাদৃশ্য আছে।

মহাবীরসহ তীর্থঙ্করদের নগ্ন মূর্তি

ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু

বিম কদফিস, কণিষ্ক ও চষ্টনের মূর্তি

বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও মথুরা শিল্পে স্থান পেয়েছে। কোনো মন্দির বা বিহারের বিস্তবান পৃষ্ঠপোষক মথুরা ভাস্কর্যের উপজীব্য হয়েছে। বিম কদফিস ও কণিষ্কের মতো কুষাণরাজ এবং চষ্টনের মতো শকরাজকে নিয়ে মথুরা ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। বিম কদফিসকে দেখা যায় সিংহাসনে আসীন, কণিষ্ক একটি বেদীর ওপর দণ্ডায়মান। কণিষ্কের মূর্তিতে মস্তক অনুপস্থিত। উভয় মূর্তিতেই দেখা যায় ভারী পোশাক, বুট জুতো ও হাতে অস্ত্র। মূর্তির অভিব্যক্তি বীরত্বব্যঞ্জক। শকরাজ চষ্টনের মূর্তির আদলও একই ধরনের। উপরোক্ত মূর্তিগুলিতে মধ্য এশিয় বা শক প্রভাব কিছু থাকলেও শিল্প-বিশেষজ্ঞগন মনে করেন তা ছিল স্বল্প স্থায়ী। ভারতীয় ভাবধারাই মথুরা শিল্পকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। মথুরা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিছু স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে যার ওপর গৌতম বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য পুরুষমূর্তি ছাড়াও উৎকীর্ণ হয়েছে যক্ষিণী, বৃক্ষকা ও অপ্সরার মতো অর্ধ-নগ্ন নারীমূর্তি। মূর্তিগুলির অঙ্গভঙ্গিমায় দেহমনস্কতা প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় ভাবধারার প্রাধান্য

নারীমূর্তি

গান্ধার ও মথুরা শিল্পের তুলনা

গান্ধার ও মথুরা শিল্পের তুলনা করতে গেলে দেখা যায় প্রথমটির বিষয়বস্তু ভারতীয় হলেও গ্রীক ভাবধারায় তা প্রভাবিত হয়েছিল। অপর দিকে মথুরা শিল্পের মূলসুরটি ভারতীয়। শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য মনে করেন মথুরার ওপর গান্ধার শিল্পের প্রভাব কিছুটা যে পড়েছিল তা বোঝা যায় মূর্তিগুলির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে। কিন্তু এ প্রভাব ছিল স্বল্পস্থায়ী। তা মথুরা শিল্পের মৌলিক চরিত্রকে পরিবর্তন করতে পারেনি।

কৃষ্ণা-গোদাবরীর বদ্বীপ শিল্প-নিদর্শনের প্রাপ্তিস্থান

(গ) বেঙ্গী বা অমরাবতী শিল্প ঃ গান্ধার ও মথুরা শিল্পের বৃত্তের বাইরে খ্রীঃ দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে বেঙ্গী বা অমরাবতীকে কেন্দ্র করে এক শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। এই শিল্প সাতবাহনরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এই শিল্প শৈলীর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে নাগার্জুনকোণ্ডা,

গোলি, জগ্গয়পেত, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে। এই অঞ্চলগুলিতে আবিষ্কৃত ভাস্কর্যের শৈলী একই ধরনের। এখানকার নর-নারীর মূর্তিগুলি শীর্ণ, উৎফুল্ল ও তাদের অঙ্গভঙ্গী জটিল। শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন স্বতন্ত্রভাবে মূর্তিগুলি দৃষ্টিনন্দন হলেও সামগ্রিকভাবে তা দর্শকদের মুগ্ধ করে না। খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওই অঞ্চলে নাগার্জুন বৌদ্ধধর্মকে নতুন উদ্যোগে জনপ্রিয় করে তোলায় গৌতম বুদ্ধের মূর্তি বেঙ্গী শিল্পে তার স্থান করে নেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে নাগার্জুনকোণ্ডায় স্তূপ, চৈত্য ও বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া চুনাপাথরের ফলকে গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। শিল্প-বিশেষজ্ঞদের মতে উত্তর ভারতের শিল্পরীতি থেকে বেঙ্গী শিল্প সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হলেও দীর্ঘদিন সে তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছিল।

বৌদ্ধ বিষয়বস্তু

৪.ধর্মনির্ভর স্থাপত্যকলার বিভিন্ন রূপ

(ক) স্তূপ ঃ মৌর্য তথা প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যকলার অন্যতম নিদর্শন স্তূপ। বৈদিক রীতি অনুসারে কোনো মৃত ব্যক্তির দেহভস্মের ওপর সমাধি নির্মিত হত বলে শোনা যায়। বৌদ্ধরীতি অনুসারে স্তূপ ছিল কোনো মহাত্মার সমাধির ওপর নির্মিত কাঠামো। কালক্রমে স্তূপ স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। উপাসনার স্থল ও চৈত্য গুহাতেও স্তূপ নির্মিত হত। জৈনধর্মেও স্তূপকে স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে দেখা হত।

স্মৃতিস্তম্ভ

বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে উল্লেখ আছে যে মৌর্যরাজ অশোক সারা ভারতে চুরাশি হাজার স্তূপ নির্মাণ করেন। মাত্র কয়েকটি ছাড়া এর অধিকাংশই ধ্বংসে হয়ে গেছে। নেপালে আবিষ্কৃত একটি স্তূপে অশোক কর্তৃক নির্মিত মূল কাঠামোটি বজায় আছে। অধিকাংশ স্তূপই নির্মাণের পর বিভিন্ন সময়ে পরিবর্ধিত হয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্যকলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ভূপালের কাছে সাঁচীর বৃহদায়তন স্তূপটি। এটি উচ্চতায় প্রায় পঁচাত্তর ফুট ও এর ব্যাস প্রায় একশো দশ ফুট। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্তূপটির আয়তন দ্বিগুণ করা হয়। এর চারপাশের মূল বেষ্টনীটি প্রথমে ছিল কাঠের, পরে এর স্থলে নয় অথবা এগারো ফুট উঁচু পাথরের রেলিং নির্মিত হয়। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে চারটি বিশাল তোরণ নির্মিত হয়। তোরণের গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য পরিণত ও উচ্চমানের শিল্পগুণসম্পন্ন। পরবর্তীকালের স্তূপগুলিতে অলঙ্করণ বৃদ্ধি পায়। খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া অমরাবতী স্তূপ সাঁচীর স্তূপের চেয়ে আয়তনে বড়ো ও অলঙ্করণেও উন্নততর মানের। এখানকার ভাস্কর্যে গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনী বিধৃত হয়েছে। অন্ধ্র অঞ্চলে অমরাবতী ছাড়াও ভট্টিপ্রোলু, ঘণ্টসাল, নাগার্জুনকোণ্ডা প্রভৃতি স্থানে অনেক স্তূপ নির্মিত হয়েছিল যেগুলি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। শুঙ্গ শাসনকালে নির্মিত ভারহুত স্তূপের শুধু বেষ্টনীটুকু অবশিষ্ট আছে। এর গায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে গৌতম বুদ্ধের জীবন ও জাতকের কাহিনী। রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ারে কণিষ্ক নির্মিত স্তূপটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ভারতে আবিষ্কৃত স্তূপগুলির মধ্যে এটি ছিল বৃহত্তম। গান্ধার অঞ্চলে উৎখননের ফলে এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়া শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুর, সোয়াট উপত্যকার চকপত, পাঞ্জাবের মানিকওয়ালা প্রভৃতি স্থানেও প্রাচীন স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে।

অশোক নির্মিত চুরাশি হাজার স্তূপ

নেপালে আবিষ্কৃত স্তূপ

সাঁচী স্তূপ

অমরাবতী স্তূপ

ভারহুত স্তূপ

পুরুষপুর স্তূপ

বৃহদায়তন স্তূপগুলিকে ঘিরে অনেক ক্ষেত্রে ছোট স্তূপ নির্মিত হত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেহাবশেষ সেখানে সমাধিস্থ করা হত। অনেক স্তূপে প্রার্থনা গৃহ ও যাত্রী নিবাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। স্তূপের আকৃতি স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হত। প্রথম দিকে পর পর ইঁট গেঁথে জমি থেকে গম্বুজাকৃতি সোজা স্তূপটি ওপরে উঠে যেত। পরবর্তীকালে এর চতুষ্কোণ মঞ্চের ওপর থেকে স্তূপটির নির্মাণ শুরু হত। স্তূপগুলি রং করা হত ও এর

ক্ষুদ্রাকার স্তূপ

স্তূপের গঠনে বৈচিত্র্য

শিখরভাগে শোভা পেত কাঠ বা পাথরের ছত্র। শিল্প-বিশেষজ্ঞদের মতে স্তূপের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক হিসাবে।

পর্বত গাত্রে চৈত্য নির্মাণের কারণ

(খ) চৈত্য ঃ চৈত্য বা চৈত্যগৃহগুলি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত কৃত্রিম গুহা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চৈত্যগুলি পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হত। এর কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, পাহাড়গুলির প্রাকৃতিক উপাদান, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে, চৈত্য নির্মাণের অনুকূল ছিল। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন স্থায়িত্বের জন্য পর্বতগাত্রে নির্মিত পাথুরে গুহাগুলিকেই দেবতার স্থায়ী আলয় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়।

চৈত্যের গঠন

চৈত্যগুলি হত আয়তাকার। এর মাঝখানে থাকত এক বিশ্রামস্থল যেখানে শোভা পেত একটি স্তূপ। এর চারদিকে স্তম্ভবেষ্টিত ঘোরানো জায়গা থাকত। স্তূপ প্রদক্ষিণের জন্য সম্ভবত এটি রাখা হয়েছিল। চৈত্যের ওপরে থাকত ধনুকাকৃতি ছাদ। স্তূপের বিপরীতে থাকত একটি দরজা যার ওপরে শোভা পেত বড় জানালা।

চৈত্যের প্রাপ্তিস্থান

লোমশ ঋষি গুহা, নাগার্জুন চৈত্য, ভাজার চৈত্য

অজন্তা, বেদসা, পাণ্ডুলেনা, কার্লে

ভারতে চৈত্যের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে গয়ার কাছে বারাবর পাহাড়ে। এখানকার গুহাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোমশঋষি গুহাটি। সন্নিকটে নার্গার্জুন চৈত্যের প্রবেশপথে কিছু ভাস্কর্যের চিহ্ন আছে। পরবর্তীকালে সাতবাহনরাজগণ পর্বতগাত্রে যে চৈত্য নির্মাণ করেন তার মধ্যে প্রাচীনতম পুনার কাছে ভাজার চৈত্য। এর নির্মাণকাল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পশ্চিম ভারতে চৈত্য নির্মাণের এই ঐতিহ্য অজন্তার একটি গুহা, বেদসা ও নাসিকের পাণ্ডুলেনার চৈত্যের মধ্যে দিয়ে কার্লের বৃহদায়তন চৈত্যে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। কার্লের চৈত্যটির নির্মাণ শুরু হয় খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ায়। চৈত্য পরিকল্পনা ও তার অলঙ্করণের দিক থেকে এটি ছিল উন্নতমানের।

গুপ্তযুগের চৈত্য

অজন্তা, ইলোরা, বাঘগুহা

গুপ্তযুগের চৈত্য স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অজন্তা, ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদ ও মধ্যপ্রদেশের বাঘগুহার চৈত্যগুলি। অজন্তার উনিশ ও ছাব্বিশ নম্বর গুহাদ্বয় চৈত্যগুহা। দ্বিতীয়টিতে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির দেখা মেলে। ইলোরার দশ নম্বর গুহাতেও বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। মনে করা হয় বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের মূর্তিপূজার প্রচলন যখন হয় তখন থেকে চৈত্য নির্মাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পায়।

(গ) সঙ্ঘারাম বা বিহার ঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসস্থল হিসাবে নির্মিত সঙ্ঘারাম বা বিহারগুলি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। একটি চতুষ্কোণ সমতল স্থানকে ঘিরে সারিবদ্ধ ছোটো ঘরের সমষ্টি নিয়ে একটি সঙ্ঘারাম স্থাপিত হত। প্রথমে এগুলির নির্মাণ কাজে কাঠ ব্যবহার করা হত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সঙ্ঘের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘারামগুলির আয়তন বৃদ্ধি পায় ও কাঠের স্থলে এগুলি ইঁট দিয়ে নির্মিত হতে থাকে। এই ধরনের সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ সাঁচী, সারনাথ, বৈশালী, কাশিয়া, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে। খ্রীঃ পূঃ প্রথম থেকে খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত এগুলির অস্তিত্ব ছিল।

বৌদ্ধ সঙ্ঘের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘারামের গুরুত্ব বৃদ্ধি

অজন্তা, ইলোরা ও বাঘগুহা

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

পর্বতগাত্রে যে সঙ্ঘারাম নির্মিত হয়েছিল তাদের সংখ্যা বেশি। এগুলির মধ্যে বারাবর ও নাগার্জুনের গুহাগুলি সবচেয়ে প্রাচীন। আজীবিকদের বাসস্থল হিসাবে মৌর্যরাজ অশোক ও দশরথ এগুলি নির্মাণ করেন। সুদাম ও লোমশঋষি গুহা এবং রাজগৃহের সোনভাণ্ডার গুহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে সাইত্রিশটি জৈনগুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতল রানিগুম্ফ সঙ্ঘারামটি বৃহত্তম। অজন্তায় প্রায় কুড়িটি সঙ্ঘারামগুহা আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি গুপ্তযুগের বিভিন্ন সময়ে নির্মিত। অজন্তার গুহাগুলির বৈশিষ্ট্য স্তম্ভযুক্ত হলঘর। এদের কয়েকটিতে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আছে। অজন্তার স্তম্ভগুলির বৈশিষ্ট্য এর অধিকাংশেরই শীর্ষে গদির অস্তিত্ব। বাঘগুহার সঙ্ঘারামগুলি

অজন্তার তুলনায় অনেক সাধারণ। বাঘে হলঘরে বুদ্ধমূর্তির স্থলে চৈত্য দেখা যায়। এগুলি খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত বলে মনে করা হয়। ঔরঙ্গাবাদের গুহাগুলির মধ্যে অধিকাংশই সঙ্ঘারাম। অজন্তার তুলনায় এখানে শিল্পকর্ম কম। এগুলি গুপ্ত-পরবর্তীযুগের নির্মাণ। ইলোরাতে বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য তিন ধরনের সঙ্ঘারাম পাওয়া গেছে যেগুলি গুপ্তপরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ্য সঙ্ঘারাম উদয়গিরিতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার বলে মনে করা হয়।

বারাবর ও নাগার্জুনি

বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সঙ্ঘারাম

৫. গুপ্তযুগের শিল্পকলা

গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ করা যায়। পাটলিপুত্র, বারাণসী, মথুরা, উদয়গিরি, ভিলসা, এরাণ, দেওগড় প্রভৃতি স্থানে গুপ্ত শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, প্রাকৃতিক কারণে ও তুর্কী আক্রমণের ফলে গুপ্ত স্থাপত্যের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে।

গুপ্ত শিল্পের নিদর্শন

(ক) স্থাপত্য ঃ পর্বতগুহা স্থাপত্য ও মন্দির স্থাপত্য, এই দুই ভাগে গুপ্ত স্থাপত্যকে ভাগ করা হয়। প্রধানত বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতায় পাহাড় কেটে গুহা স্থাপত্য নির্মিত হয়। দুরকম গুহা এ যুগে দেখা যায়, চৈত্য এবং সঙ্ঘারাম বা বিহার। দুরকম গুহার নিদর্শনই পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রের অজন্তা, ইলোরা ও ঔরঙ্গাবাদ এবং মধ্যপ্রদেশের বাঘ অঞ্চলে। অজন্তার মোট আঠাশটি গুহার মধ্যে বেশ কয়েকটি গুপ্তযুগের পূর্বে নির্মিত। গুপ্তযুগের নির্মিত গুহাগুলির মধ্যে দুটি ছিল গুহা চৈত্য। দুটির মধ্যেই বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ইলোরায় একটিমাত্র চৈত্য গুহার সন্ধান মিলেছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসগৃহ হিসাবে পর্বতগাত্রে নির্মিত হত সঙ্ঘারাম বা বিহার। গুপ্তযুগে নির্মিত প্রায় কুড়িটি বিহার অজন্তায় পাওয়া গেছে। বিহারগুলিতে স্তম্ভযুক্ত বড় হলঘর রয়েছে। বিহারের দেওয়ালগুলির অলঙ্করণ উচ্চমানের। ঔরঙ্গাবাদ ও বাঘেও বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এগুলির শিল্প সুষমা অজন্তার মতো নয়। গুপ্তযুগের গুহা স্থাপত্যগুলি প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাতেও গুহামন্দির স্থাপিত হয়েছে। যেমন, গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে নির্মিত উদয়গিরির গুহামন্দির।

পর্বতগুহা স্থাপত্য

অজন্তা, ইলোরা ও বাঘ

প্রধানত বৌদ্ধ প্রভাব

ব্রাহ্মণ্য পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টান্ত

গুপ্তযুগে মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। কাঠ ও বাঁশের স্থলে এযুগেই প্রথম ইঁট ও পাথরের মতো স্থায়ী উপকরণ দিয়ে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল। গুপ্ত মন্দিরগুলির অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। সমকালীন লেখমালা, ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের মতো বিদেশী পর্যটকদের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য সাহিত্যগত সাক্ষ্যে মন্দিরগুলি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। স্থাপত্য-শৈলী ও পরিকল্পনার দিক থেকে বিচার করে শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ গুপ্ত মন্দিরগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি আকৃতিতে বর্গাকার, ছাদ ছিল সমতল ও মন্দিরের সামনে থাকত খোলা বারান্দা। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত সাঁচী ও তিগয়ার মন্দির এবং এরাণের বিষ্ণু মন্দির এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মন্দিরগুলিও ছিল বর্গাকার ও সমতল ছাদযুক্ত। কিন্তু এগুলির গর্ভগৃহের চারদিকে ছিল ঢাকা প্রদক্ষিণ পথ ও সামনে খোলা মণ্ডপ। মধ্যপ্রদেশের নাচনাকুঠারার পার্বতী মন্দির, ভুমারের শিবমন্দির, দক্ষিণ ভারতের আইহোলের নিকট লাদখান ও সেওতির মন্দির এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মন্দিরগুলি বর্গাকার কিন্তু ওপরে ছিল নীচু শিখর। এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাথরে নির্মিত দেওগড়ের দশাবতার মন্দির ও ইঁট নির্মিত কানপুরের ভিতরগাঁও মন্দির। এছাড়া নাচনাকুঠারার মহাদেব মন্দির ও বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরও এই শ্রেণীভুক্ত। চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরগুলি ছিল আয়তাকার যার পেছন দিকটি অর্ধবৃত্তাকার ও শিখর চূড়ার মতো। খ্রীঃ চতুর্থ থেকে

মন্দির স্থাপত্য

ঐতিহাসিক উপাদান

মন্দির স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী

পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত সোলাপুর জেলার তের-এর মন্দিরগুলি ও কৃষ্ণা জেলার চেজারলার কপোতেশ্বর মন্দির এই শ্রেণীভুক্ত। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত আইহোলের দুর্গা মন্দির এই পর্যায়ভুক্ত। পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিছু বৃত্তাকার মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। মন্দিরগুলির নির্মাণশৈলী অনেকটা বৌদ্ধ স্তূপের মতো। রাজগীরের মণিনাগ মন্দির এই শ্রেণীভুক্ত।

নাগর ও দ্রাবিড় শৈলী

গুপ্তযুগের মন্দির পরিকল্পনায় নাগর ও দ্রাবিড় শৈলীর প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রথম রীতির মন্দির পরিকল্পনা ছিল ক্রশ আকৃতি বিশিষ্ট যার শিখর ছিল রেখ ধরনের। দ্বিতীয় শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরের ছাদ থাকের উপর্যুপরি বিন্যাসে নির্মিত। সরসী কুমার সরস্বতী মনে করেন গুপ্ত ও সমকালীন যুগে উদ্ভাবিত নাগর ও দ্রাবিড় শৈলী মধ্যযুগের ভারতের মন্দির স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

গ্রীক প্রভাবিত ভাস্কর্যের ভারতীয়ত্ব অর্জন

(খ) ভাস্কর্য ঃ গুপ্তযুগের ভাস্কর্য ছিল বিগত শতাব্দীগুলির শিল্প-ভাবনার ক্রমবিবর্তনের ফসল। গুপ্ত ভাস্কর্যে মথুরা শিল্প যেন অনেকটা পরিশীলিত হয়েছে ও গ্রীক প্রভাবিত গান্ধার শিল্পও যেন ভারতীয়ত্ব অর্জন করেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার পরিসীমা পার হয়ে গুপ্ত ভাস্কর্য ভারতের সর্বত্র, এমনকি ভারতের বাইরেও প্রসারলাভ করে। গুপ্তভাস্কর্যের তিনটি প্রধান ধারা ছিল—মথুরা, সারনাথ ও পাটলিপুত্র।

মথুরা ধারা

মথুরার বেলেপাথরের তৈরি গৌতম বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলিতে গান্ধার শিল্পের প্রভাব ছিল। মথুরার বুদ্ধমূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জামালপুরে প্রাপ্ত খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, কাটরায় প্রাপ্ত খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বুদ্ধমূর্তি, কুশীনগরে প্রাপ্ত খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শায়িত বুদ্ধমূর্তি, এলাহাবাদের কাছে মানকুয়ারে প্রাপ্ত খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর মুণ্ডিত মস্তক বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি। শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন কুষাণ যুগের স্থূলতা ও বিশালতা গুপ্তযুগের মূর্তিগুলিতে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। সারনাথ শিল্পরীতির বুদ্ধমূর্তিগুলিতে বিদেশী প্রভাব ছিল না। বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ছাড়াও গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ হয়েছে। সারনাথে গৌতম বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন বা প্রথম ধর্ম প্রচারকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির মাধ্যমে। মূর্তির পাদপীঠে ধর্মের প্রতীক হিসাবে চক্র উৎকীর্ণ হয়েছে। মূর্তির দুপাশে গৌতম বুদ্ধের পাঁচ শিষ্যের মূর্তি শোভা পেয়েছে, যাদের কাছে তিনি প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। শিশুসহ এক নারীমূর্তিও উৎকীর্ণ হয়েছে, যাকে বুদ্ধমূর্তিটির দাতা বলে মনে করা হয়। 'পেলব অঙ্গ-সৌষ্ঠবের' সঙ্গে 'ইন্দ্রিয়াতীত অতি-জাগতিক সৌন্দর্য' যুক্ত হওয়ায় শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মূর্তিটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। পাটলিপুত্রে নির্মিত গৌতম বুদ্ধের মূর্তিতে সারনাথ শিল্পরীতির আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের আবেদন। ভাগলপুরের কাছে সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বিশালাকার বুদ্ধের তাম্রমূর্তি, নালন্দায় প্রাপ্ত বুদ্ধের ধাতব মূর্তি, রাজগীরে মণিয়ার মাঠের মূর্তিগুলি পাটলিপুত্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এর ওপর মথুরা ও সারনাথ শিল্পরীতির প্রভাবও পড়েছিল।

সারনাথ ধারা

পাটলিপুত্র ধারা

বৈষ্ণব ও শৈব ভাস্কর্য

মথুরা, সারনাথ ও পাটলিপুত্র ভাস্কর্য শিল্পরীতি ছিল প্রধানত বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে কেন্দ্র করেও, বিশেষ করে বৈষ্ণব ও শৈব ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। উদয়গিরি, ভিলসা, এরাণ, দেওগড়, ভিতরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলেও এ যুগে শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। উদয়গিরিতে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত বিষ্ণুর বরাহমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেওগড় মন্দিরে পাওয়া গেছে একই সময়ে নির্মিত অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু মূর্তি। দেওগড় মন্দিরে শিবের যোগী মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এলাহাবাদের কাছে কোসামে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শিব-পার্বতী মূর্তি পাওয়া গেছে। ভুমরা মন্দিরের সূর্য মূর্তি ও আজমীরের কাছে প্রাপ্ত সাতঘোড়ার মূর্তি সৌর শিল্পের নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

সৌর শিল্প

শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন গুপ্তযুগের শিল্প একটি দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। মথুরা ও সারনাথ শিল্প চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের শিল্প-নিদর্শনগুলির তুলনা করলে দেখা যায় পূর্ব ভারতের ভাস্কর্যগুলি কৃশ ও অঙ্গসৌষ্ঠবে মাধুর্যময়, অপরদিকে পশ্চিম ভারতের ভাস্কর্য বা মূর্তিগুলি গুরুভার ও কাঠিন্যযুক্ত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পূর্ব ভারতে সারনাথ ও পশ্চিম ভারতে মথুরা শিল্পের প্রভাব ছিল বেশি।

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ভাস্কর্য সুষমার পার্থক্য

(গ) চিত্রকলা : গুপ্তযুগে চিত্রকলাও উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। রঘুবংশ, মেঘদূত ও মালবিকাগ্নিমিত্রমের মতো কালিদাসের রচনাবলীতেরাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত চিত্রশালার উল্লেখ আছে। সে যুগে সঙ্গীতশালার দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের চিত্র শোভা পেত। বসতবাড়ি ও রাজপ্রাসাদের গায়েও চিত্রাঙ্কনের কথা বলা হয়েছে।

কালিদাসের রচনায় চিত্রকলার উল্লেখ

গুপ্ত চিত্রকলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অজন্তাগুহাচিত্র। অজন্তার মোট তিরিশটি গুহাচিত্র বা 'ফ্রেসকোর' মধ্যে পাঁচটির সৃষ্টি গুপ্তযুগ ও তার কিছু পরে। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু প্রধানত গৌতম বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও জাতকের গল্প। এছাড়া গুহাগাত্রে স্থান পেয়েছে রাজপরিবারের সদস্যবর্গসহ রাজপ্রাসাদ। গরুড়, যক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরার মতো পৌরাণিক ও কাল্পনিক প্রাণী চিত্রের দেখা মেলে। এছাড়া পশুপাখী, ফুল, কৃষক ও সন্ন্যাসীর চিত্রও অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত হয়েছে। অজন্তার গুহাচিত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের চিত্রটি। তাঁর ডান হাতে শ্বেতপদ্ম ও মাথায় মণিমুক্তাখচিত মুকুট। তাঁর দৃষ্টি অবনত ও মুখমণ্ডল বেদনাহত। অজন্তার চিত্রে একটি ধর্মীয় ভাবনা পরিব্যাপ্ত থাকলেও পার্থিব জগতও স্থান করে নিয়েছে। শয়নের ভঙ্গিতে নারী, অশ্বপৃষ্ঠে রাজা, মুমূর্ষু রাজকন্যা, পরিত্যক্তা স্ত্রী, রাজগৃহের রাজপথে মগধরাজ ও গৌতম বুদ্ধ, পারসিক দূতের রাজদরবারে আগমন প্রভৃতি চিত্র এই দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত।

চিত্রের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক

পৌরাণিক ও কাল্পনিক প্রাণী

পার্থিব বিষয়বস্তুও স্থান পেয়েছে

মধ্যপ্রদেশের বাঘগুহার চিত্রাবলীতে অজন্তার শিল্প ভাবনার প্রভাব পড়েছিল। চিত্রগুলির অলঙ্করণ ও পরিকল্পনা ছিল উন্নতমানের। এক পুরুষকে ঘিরে তরুণীবৃন্দের নৃত্য, প্রেমিক-প্রেমিকা, আলাপরত কিছু পুরুষ, অশ্বপৃষ্ঠে শোভাযাত্রা, ক্রন্দনরত রমণীদ্বয়— বাঘগুহার এই চিত্রগুলি বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতিবিম্ব।

বাঘগুহাচিত্রাবলী

গুহাচিত্র অঙ্কনের জন্য যে উপকরণ ব্যবহার করা হত তা হল কাদা, গোময় ও পাথরের গুঁড়োর সঙ্গে মেশানো ধানের তুষ। এগুলি দিয়ে গুহার দেওয়ালে এক পুরু আস্তরণ বানানো হত। তার ওপর দেওয়া হত পাতলা চূণের প্রলেপ। এটি ভিজে থাকতেই এর ওপর বিভিন্ন রঙ আলতো ভাবে পালিশ করা হত। মোট ছ'টি রং লক্ষ করা যায় — সাদা, লাল, কালো, নীল, হলুদ ও সবুজ। রঙের ব্যবহার এমনভাবে করা হয়েছে যে চিত্রগুলিকে ত্রিমাত্রিক বলে মনে হয়।

চিত্রাঙ্কণের উপকরণ

রঙের ব্যবহার

৬. পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশে শিল্পকলা

গুপ্ত-পরবর্তী যুগে প্রায় সাত শতাব্দী কাল ভারতে কোনো বড়ো সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান হয়। এর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশে খ্রীঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পালবংশ এবং খ্রীঃ দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত সেনবংশের রাজারা রাজত্ব করেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা ছাড়াও আঞ্চলিক স্তরে পাল ও সেনরাজগণ সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পাল ও সেন শাসনকালের শিল্পকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা।

আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পাল ও সেন বংশের উত্থান

(ক) স্থাপত্য ঃ পাল-সেন শাসনকালে স্থাপত্য বলতে বোঝাতো প্রধানত স্তূপ, বিহার ও মন্দির। চীনা পর্যটকদের বৃত্তান্তে বাংলাদেশে অসংখ্য স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

স্তূপ

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও তুর্কী আক্রমণের কারণে স্তূপগুলির অধিকাংশ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

নিবেদক স্তূপ

যেগুলির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ সেগুলিকে নিবেদক স্তূপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে ভ্রমণে আসা পুণ্যার্থীরা বিভিন্ন আকারের এই স্তূপ নির্মাণ করত। স্তূপগুলি ছিল সাধারণত ইঁট ও পাথরের তৈরি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্তূপের মতো বাংলাদেশেও স্তূপকে ঘিরে থাকত বেষ্টনী ও তোরণ। এ দুটিতেই সুন্দরভাবে অলঙ্করণ করা হত। পাহাড়পুরে সত্যপীড়ের ভিটায় এবং বাঁকুড়ার বহুলারায় ইঁটের তৈরি নিবেদক স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত। স্তূপগুলির অভ্যন্তরে বৌদ্ধসূত্র উৎকীর্ণ প্রচুর মাটির সীলমোহর পাওয়া গেছে। গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের পরিবর্তে এগুলিকেই স্তূপের ভিতর স্থাপন করা হত। বর্ধমানের ভরতপুর গ্রামে একটি বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঢাকা

ব্রোঞ্জ স্তূপ

জেলার আশরফপুরে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর একটি ব্রোঞ্জ স্তূপ পাওয়া গেছে। রাজশাহী জেলায় পাহাড়পুর ও চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারী গ্রামেও একই ধরনের স্তূপ পাওয়া

পাণ্ডুলিপি চিত্রে উৎকীর্ণ স্তূপ

গেছে। এগুলি ছাড়া পাল-সেন যুগের অনেক পাণ্ডুলিপি চিত্রে কিছু স্তূপ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরেন্দ্রীর মৃগ স্থাপন স্তূপ ও তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান স্তূপ। এই স্তূপগুলির নির্মাণশৈলী একই ধরনের।

বিহার

পাল-সেন যুগের বিহারগুলি প্রথমে ছিল বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসস্থল, পরে এগুলি শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে পাহাড়পুরে বিখ্যাত সোমপুর বিহার

সোমপুর বিহার

আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি পালরাজ ধর্মপালের শাসনকালে নির্মিত। বিহারটি আয়তনে ছিল বিশাল। বিহারের প্রাঙ্গণকে ঘিরে সারি সারি একশো আটটির বেশি কক্ষ ছিল। প্রাঙ্গণের মাঝখানে ছিল একটি উঁচু মন্দির। বিহারকে বেষ্টন করেছিল এক প্রশস্ত প্রাচীর। সুদীর্ঘ পাল শাসনকালে এর সংস্কার হয়েছিল, কিন্তু কোনো নতুন সংযোজন হয়নি বলে মনে করা হয়। কুমিল্লার কাছে ময়নামতীতে সোমপুর বিহারের চেয়েও ময়নমতী ও কর্ণসুবর্নের বিহার বড়ো বিহারের অস্তিত্ব ছিল। কর্ণসুবর্ণেও একই ধরনের বিহার পাওয়া গেছে।

মন্দির

পাল-সেন যুগে বাংলাদেশে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। খ্রীঃ একাদশ ও দ্বাদশ

সোমপুর বিহারের মন্দির

শতাব্দীতে নির্মিত কিছু মন্দিরের ভগ্ন অস্তিত্ব আজও চোখে পড়ে। সোমপুর বিহারের অভ্যন্তরে শোভিত মন্দিরটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনশো সাতান্ন ফুট এবং প্রস্থে তিনশো পনেরো ফুট। মন্দিরের কেন্দ্রে ছিল একটি সুউচ্চ স্তম্ভ। মন্দিরে তল ছিল সম্ভবত পাঁচটি। দ্বিতীয় তলে ছিল চারটি গর্ভগৃহ। প্রত্যেকটির সামনে থাকত বড়ো মণ্ডপ। পোড়ামাটির ইঁট দিয়ে কাদার গাঁথুনিতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। পালরাজ ধর্মপালের সময়ে মন্দিরটির মূল পরিকল্পনা রচিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে এর নির্মাণ কাজ চলেছিল। খ্রীঃ অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত বেশ কিছু ভগ্নপ্রায় মন্দির পাওয়া গেছে, স্থাপত্য শিল্পে

শিখর দেউল মন্দির

যাদের নাম রেখ বা শিখর দেউল। পুরুলিয়া জেলার চারায় আবিষ্কৃত জৈনমন্দির, বাঁকুড়ার বহুলারা গ্রামের সিদ্ধেশ্বর মন্দির, একই জেলার দেহরগ্রামের সর্বেশ্বর মন্দির ও সল্লেশ্বর

তেলকুপীর মন্দির

মন্দির, সুন্দরবনের জটার দেউল মন্দির, বর্ধমান জেলার গঙ্গারামপুরের মন্দির প্রভৃতি শিখর দেউল শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মচর্চার কেন্দ্র পুরুলিয়া জেলার তেলকুপীতে বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল, এখন যার কোন অস্তিত্বই নেই। শিখর দেউলের এই মন্দিরগুলির সঙ্গে ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির অনেক সাদৃশ্য ছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরটি বাদ দিলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মন্দিরই আয়তনে ছোটো ছিল।

(খ) ভাস্কর্য : রাজনৈতিক দিক থেকে পালযুগে বাংলাদেশের এক স্বতন্ত্র সত্তা গড়ে ওঠে। এর প্রতিফলন দেখা যায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভাস্কর্যে। আঞ্চলিক আদর্শ ও ধারণার লক্ষণ পাল-সেন যুগে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ যুগের প্রায় সব মূর্তিই সূক্ষ্ম বা মোটা দানার কষ্টিপাথরে নির্মিত। ধাতব মূর্তিগুলি নির্মিত পেতল ও অষ্টধাতু দিয়ে। সোনা-রূপার মূর্তিও কিছু পাওয়া গেছে। কিছু কাঠের মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। পাথর ও ধাতুর তৈরি সব মূর্তির পেছনে একটি করে চালচিত্র দেখা যায়। দেবদেবীর আকৃতিতে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব দুরকম প্রকাশ লক্ষণীয়। মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ সবক্ষেত্রে নিখুঁত ছিল না। তবে প্রতিমার অলঙ্করণের কাজ ছিল পরিপাটি। নীহার রঞ্জন রায় দেখিয়েছেন পাল-সেনযুগের মূর্তি শিল্পে একদিকে যেমন একটি সাধারণ ধারা ফুটে উঠেছে, তেমনই তার মধ্যেই স্থান পেয়েছে বহু বৈচিত্র্য। প্রতিমা নির্মাণে নানা জাত, নানা জন, নানা ভিন্ন প্রদেশের মুখের আদল এসেছে। তার ওপর প্রতিটি শিল্পীর নিজস্ব রুচি ও গঠনরীতির ছাপ অনিবার্যভাবে পড়েছে। কিন্তু কোনো কোনো শিল্প-বিশেষজ্ঞ মনে করেন পালযুগে ভাস্কর্য ছিল উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ও এর পেছনে ধর্মীয় প্রেরণাই ছিল মুখ্য। শিল্পে সাধারণ মানুষের কোনো স্থান না থাকায় একে লোকায়তশিল্প বলতেও তাঁরা নারাজ। কিন্তু এই যুগের শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিম্নকোটির মানুষ। তাঁরা সকলেই ছিলেন পেশাগত শ্রেণী বা নিগমের সদস্য। তবে তাঁদের সামাজিক অবস্থান শিল্পসৃষ্টিকে কোনো ভাবে প্রভাবিত করেনি। সেন যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল, সাহিত্যের মতো ভাস্কর্যেও জাঁকজমক ও আড়ম্বর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা যেন এ যুগের মূর্তিগুলিকে গ্রাস করে। পূর্বেকার মূর্তিগুলির মুখাবয়বে যে গাম্ভীর্য ও প্রশান্তির ছাপ ছিল, সেনযুগে তা অন্তর্হিত হয়। গুপ্তভাস্কর্য ও পালভাস্কর্যের মধ্যে যে ভারসাম্য গড়ে উঠেছিল সেন যুগে তা হারিয়ে যায়।

কষ্টি পাথর ও ধাতব মূর্তি

দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রকাশ

লোকায়ত না উচ্চবিত্তের ভাস্কর্য-বিতর্ক

সেনযুগে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রাধান্য

পাল-সেন যুগের ভাস্কর্য শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তার মৃৎশিল্প। মন্দির নির্মাণে পর্যাপ্ত পাথরের অভাবে মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হত বলে মনে করা হয়। ফলকগুলিতে স্থান পেয়েছে সাধারণ মানুষের সহজ, সরল বিচিত্র জীবনের নিখিল, তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম, দুঃখ-বেদনা ও তামাসা-ফূর্তি। দেবদেবী, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, সকলেরই সেখানে স্থান হয়েছে।

মৃৎশিল্প, পোড়ামাটির ফলক

পাল-সেন যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ছিলেন ধীমান ও তাঁর পুত্র বীটপাল। উভয়েই খোদাইয়ের কাজ, ধাতব মূর্তি নির্মাণ ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে দিক্‌পাল ছিলেন। এঁরা ছাড়া খোদাইকর হিসাবে যাদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন ভাস্কর, মংকদাস, বিমলদাস, বিষ্ণুভদ্র, কর্ণভদ্র, মহীধর, শশীদেব, তথাগতসার প্রমুখ। পাল-সেনযুগের অজস্র ভাস্কর্য-নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকার চণ্ডীমূর্তি, রংপুরের বিষ্ণুমূর্তি, দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত স্বয়ম্ভনাথের মূর্তি, বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত বরাহ অবতারের মূর্তি, ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি, দেওপাড়ার গঙ্গামূর্তি, ঢাকা জেলায় প্রাপ্ত বাসুদেব মূর্তি, রাজশাহী জেলায় প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি, বারাকপুরের বজ্রাসন মূর্তি প্রভৃতি।

ধীমান ও বীটপালসহ অন্যান্য ভাস্কর

ভাস্কর্যের প্রাপ্তিস্থান

(গ) চিত্রকলা : পালযুগের শিল্পকর্মের এক আকর্ষণীয় দিক চিত্রকলা। ফা-হিয়েনের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তালপত্রলিপিতে চিত্রকলার প্রচলন ছিল। কিন্তু তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গেছে তা খ্রীঃ আনুমানিক একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি। প্রধানত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিগুলির অলঙ্করণের জন্য এই চিত্রকলার সৃষ্টি। অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, কারণ্ডব্যূহ, বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি পাণ্ডুলিপিতে এই অলঙ্করণ দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিগুলির অধিকাংশই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্ম সংক্রান্ত। এগুলি ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও দেশবিদেশের গ্রন্থাগার ও চিত্রশালায় এখনও রক্ষিত আছে।

বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপির অলঙ্করণের জন্য চিত্রকলার সৃষ্টি

পাণ্ডুলিপি তালপাতা ও কাগজে লেখা

পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি বেশিরভাগ তালপাতায় লেখায়, একটিমাত্র লেখা কাগজে। খুব স্বল্প পরিসরের মধ্যে আঁকা হলেও চিত্রগুলিকে 'মিনিয়েচার পেন্টিং' বলা যায় না। চিত্রগুলির ভাব, পরিকল্পনা, রং-রেখা সবকিছুই বৃহদাকার প্রাচীর চিত্রের মতো। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কুড়ি-বাইশটি চিত্রের মধ্যে অধিকাংশই পাওয়া গেছে নেপালে, কিছু বাংলাদেশে, অবশিষ্ট এর বাইরে।

চিত্রগুলির প্রাপ্তিস্থান

প্রতিমা, লতা-পাতা, ফল-ফুল প্রভৃতি দিয়ে মূল চিত্রটির অলঙ্করণ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্রে ব্যবহৃত রং ও রঙের উপাদান

চিত্রগুলিতে যে রং ব্যবহার করা হয়েছে তা হল হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সাদা, গাঢ় নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুরের লাল এবং সবুজ রং। ভেতরের চিত্র মোটা রেখায় আঁকা। চিত্রের বহির্রেখা সরু। এগুলি লাল বা কালো রঙে আঁকা। চিত্রের মূল প্রতিমা, পার্শ্বপ্রতিমাগুলির থেকে আকারে বড়ো। তার পৃষ্ঠপট অলঙ্কৃত।

৭. দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলা

স্থাপত্য

(ক) পল্লব যুগ ঃ দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সূত্রপাত পল্লব যুগের মন্দিরগুলি দিয়ে। এখান থেকেই দ্রাবিড় রীতির সূচনা। পল্লব রাজধানী কাঞ্চী ও মামল্লপুরম বা মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলিকে ঘিরেই পল্লব স্থাপত্য শৈলীর ক্রমবিকাশ শুরু হয়।

মন্দির নির্মাণের চাররীতি

এই ক্রমবিকাশে চারটি রীতি লক্ষণীয়। প্রথমত, পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালে মহেন্দ্ররীতি (৬০০-৬২৫ খ্রীঃ); দ্বিতীয়ত, নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে মামল্ল রীতি (৬২৫-৬৭৫ খ্রীঃ); তৃতীয়ত, দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন বা রাজসিংহ পল্লবের রাজত্বকালে রাজসিংহ রীতি (৬৯৫-৭২২ খ্রীঃ); চতুর্থত, অপরাজিত পল্লবের রাজত্বকালে অপরাজিত রীতি (৮০০-৯০০খ্রীঃ)।

মহেন্দ্র রীতি

মহেন্দ্র রীতির বৈশিষ্ট্য হল পাহাড় কেটে তার ভেতর গুহামন্দির নির্মাণ করা। ত্রিকোণ অথবা গোলাকার স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরের ছাদ ধরে রাখা হত। গুন্টুর জেলার উত্তরবল্লির অনন্তশায়ন মন্দির, উত্তর আর্কট জেলার ভৈরবকোণ্ডের মন্দিরগুলি ও কাঞ্চীর একাম্বরনাথ মন্দিরে মহেন্দ্র রীতির স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মামল্ল রীতির

মামল্ল রীতির বৈশিষ্ট্য হল পাহাড় কেটে একটি পাথর খণ্ডে রথের আকৃতির মন্দির নির্মাণ। মহাবলীপুরমে পঞ্চপাণ্ডবের নামে পাঁচটি ও দ্রৌপদীর নামে একটি রথমন্দির এই রীতির নিদর্শন। পাণ্ডবের নামে

রাজসিংহ রীতি

নির্মিত মন্দিরগুলি শিব মন্দির বলে মনে করা হয়। রাজসিংহরীতির মন্দিরগুলি স্বতন্ত্র প্রকৃতির, পূর্বের মতো পাহাড় খোদাই করে নয়। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে এই রীতির মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হত। এই রীতির মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাবলীপুরমের তীর মন্দির, ঈশ্বর মন্দির ও মুকুন্দ মন্দির। দক্ষিণ আর্কটের পণমলইয়ের মন্দিরটি এই

অপরাজিত রীতি

শ্রেণীভুক্ত। এছাড়া ছিল কাঞ্চীপুরমে অবস্থিত কৈলাসনাথ মন্দির ও বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। অপরাজিত স্থাপত্যরীতিতে পল্লব স্থাপত্যের অবনতির ছাপ স্পষ্ট। এই শিল্পরীতি পল্লব শিল্পকে চোল শিল্পের নিকটবর্তী করেছিল। এই রীতির মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঞ্চীপুরমের মুক্তেশ্বর ও মতঙ্গেশ্বর মন্দির।

ভাস্কর্য

পল্লব ভাস্কর্য দিয়েই দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের সূচনা। পল্লব ভাস্কর্যের ওপর শেষ পর্যায়ের বেঙ্গী ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছিল বলে শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

মহাবলীপুরমেররিলিফ

পল্লব ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাবলীপুরমের বৃহদায়তন রিলিফ। এক সময় মনে করা হত যে রিলিফটির বিষয়বস্তু ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক কাহিনী। সমালোচকগণ এখন মনে করেন রিলিফে খোদাই কাহিনীটি কিরাতার্জুনের। অসংখ্য মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি এখানে স্থান পেয়েছে। জীবজন্তুর মূর্তিগুলিতে শিল্প-উৎকর্ষতার পাশাপাশি গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। মহাবলীপুরমের অনুরূপ গুহামন্দিরগুলিতেও রিলিফের কাজ চোখে পড়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষ্ণমণ্ডপে পশুপালকের জীবনকাহিনী ও

মহিষমর্দিনী মণ্ডপে দেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধের দৃশ্য। দ্বিতীয় মণ্ডপটিতে শোভিত হয়েছে বিষ্ণু শেষনাগের কুণ্ডলীর ওপর অনন্ত শয্যায় শায়িত। বরাহ মণ্ডপের দুটি রিলিফের একটিতে বিষ্ণুর বরাহ রূপে বসুন্ধরাকে উদ্ধারের দৃশ্য, অপরটিতে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম মূর্তি স্থান পেয়েছে। পল্লব ভাস্কর্যের ওপর বেসীর প্রভাব থাকলেও বেসীর তুলনায় পল্লব মূর্তিগুলি ছিল বেশি প্রাণবন্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত। অজন্তা-ইলোরার অতীন্দ্রিয়তা ও আলোছায়ার খেলার দেখা এখানে মেলে না।

কৃষ্ণমণ্ডপ, মহিষমর্দিনী মণ্ডপ
বরাহমণ্ডপ

বেসীর চেয়েও পল্লব ভাস্কর্য বেশি প্রাণবন্ত

(খ) চোলযুগ : চোল স্থাপত্যের ওপর পল্লব স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছিল। চোলযুগেই দ্রাবিড় শিল্পরীতি পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম দিককার চোল মন্দিরগুলি ছিল আয়তনে ছোটো কিন্তু গঠনশৈলী ছিল মনোরম। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চোলরাজ বিজয়চোলের শাসনকালে নির্মিত চোলেশ্বর মন্দির ও প্রথম পরান্তকের শাসনকালে নির্মিত করঙ্গনাথের মন্দির। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজরাজ ও রাজেন্দ্রচোলের শাসনকালে বিশালাকায় মন্দির নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মন্দিরগুলি বেশির ভাগই ছিল শিবমন্দির। চোলরাজ রাজরাজ ১০০৩ থেকে ১০১০ খ্রীঃ-এ মধ্যে তাঞ্জোরে নির্মাণ করেন বৃহদীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর মন্দির। রাজেন্দ্রচোল তাঁর নতুন রাজধানী গঙ্গইকোণ্ডচোলপুরমে ১০২৫ খ্রীঃ-এর এক বিশালাকার মন্দির নির্মাণ করেন। তাঞ্জোরের মতো এ মন্দিরটিও ছিল কারুকার্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ। তবে প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির উচ্চতা কম। দুটি মন্দিরের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে রাজ রাজেশ্বরের মন্দিরটির বিশালত্ব যেন মহাকাব্যের মতো, রাজেন্দ্রচোলের মন্দিরটির ঢেউ তোলা রেখাগুলির কমনীয়তা যেন গীতিকাব্যের মতো। চোল স্থাপত্যের অন্যান্য নিদর্শনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঞ্জোরের সুব্রহ্মণ্য মন্দির ও দারসুরমের ঐরাবতেশ্বর মন্দির।

স্থাপত্য

চোলেশ্বর ও করঙ্গ-নাথের মন্দির

বৃহদীশ্বর মন্দির

গঙ্গইকোণ্ডচোল-পুরমের মন্দির

সুব্রহ্মণ্য ও ঐরাবতেশ্বর মন্দির

চোল স্থাপত্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মন্দিরের গোপুরম বা সিংহদ্বার। এগুলি ছিল খুব উঁচু ও এর গায়ে ছিল সুচারু অলঙ্করণ। মূল মন্দিরের মতো গোপুরমগুলিও ছিল বহুতল ও এর শিখর ছিল উঁচু। অনেক ক্ষেত্রে বিশালাকার গোপুরমের পেছনে মূল মন্দিরটিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত। কুম্বকোনমের মন্দিরের গোপুরমটি অসাধারণ শিল্প-সুষমামণ্ডিত।

গোপুরম

পাথর ও বিভিন্ন ধাতুতে নির্মিত মূর্তিগুলি উচ্চমানের চোল ভাস্কর্যের নিদর্শন। মন্দিরের হলঘরে ও গায়ে, গোপুরমগুলিতে ও মন্দির সংক্রান্ত অট্টালিকায় নানারকম মূর্তি ও অলঙ্করণ স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য করঙ্গনাথ মন্দির, তাঞ্জোর ও গঙ্গইকোণ্ডচোলপুরমের মন্দির, দারসুরম ও কুম্বকোনমের মন্দির। তবে চোল ভাস্কর্য ধাতব মূর্তির জন্যই বেশি পরিচিত। তামা ও পঞ্চধাতু দিয়ে বেশিরভাগ মূর্তি নির্মিত হত। পরে সীসার ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ণগর্ভ মূর্তি সংখ্যায় বেশি হলেও শূন্যগর্ভ মূর্তিরও দেখা মেলে। উৎকৃষ্ট মানের মূর্তিগুলি ছিল আয়তনে বড়ো ও ওজনে ভারি। মূর্তিগুলির দেহ ছিল অনাবৃত ও মসৃণ। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাতও ছিল শিল্পশাস্ত্র সম্মত। মূর্তিগুলি নির্মিত হত মন্দিরে স্থাপনের জন্য ও সারা বছরের বিভিন্ন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য। দক্ষিণভারতে এই সময় ভক্তি আন্দোলনের প্রসার ঘটতে থাকায় শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য মূর্তিগুলিতে সেই আবেগ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটে। শিব, পার্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও রামের মূর্তির পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিও নির্মিত হয়। খ্রীঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত নটরাজ মূর্তি সমগ্র বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

ভাস্কর্য

ধাতব মূর্তি

তামা, পঞ্চধাতু ও সীসা

মূর্তি মন্দিরে স্থাপন ও শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হত

শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি

নটরাজ মূর্তি

৮. সুলতানী যুগের স্থাপত্যরীতি

(ক) ইন্দো-সারাসেনিক বা ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির উন্মেষ : খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে হত্যা ও ধ্বংসলীলা চলেছিল অবাধে। সাম্রাজ্যের বিস্তার যখন ঘটেছে তখনও অনেক সুরম্য মন্দির, নগরী ও প্রাসাদ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্য স্থিতিশীল হয়ে উঠলে এক দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও বিকাশের অধ্যায় শুরু হয়। ভারতে যে তুর্কী শাসকদের আগমন ঘটেছিল, তাঁরা কখনই অশিক্ষিত বর্বর ছিলেন না। তাঁরা এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরী ছিলেন। আব্বাসিদ খলিফাদের পতন ঘটলে তার স্থলে গড়ে ওঠা পরস্পরবিবদমান রাজ্যগুলি পূর্বতন খলিফাদের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ধারাকে মেনে চলার চেষ্টা করে। শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থেকে শুরু করে সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্থাপত্য, সব ক্ষেত্রেই তারা ইসলামীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া, খুরাসান ও ইরাণে যে ইসলামভিত্তিক পারসিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্মেষ ঘটে ভারতের তুর্কী শাসকগণ ছিলেন সেই ধারার অনুগামী।

প্রথমে ধ্বংসলীলা পরে শান্তি ও বিকাশ

তুর্কীরা পারসিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরী

ভারতে হিন্দুরাও ছিল হাজার বছর ধরে বিকশিত এক সমৃদ্ধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরী। খ্রীঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এই সমৃদ্ধি উন্নতির শীর্ষে পৌঁছয়। পরবর্তী সময়ে ভারত বিজ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীল চিন্তার দিক থেকে পিছিয়ে পড়লেও তার অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত থাকে। খ্রীঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা লক্ষ করা যায়। এই পরিস্থিতিতে তুর্কীদের ভারতে আগমন ঘটলে হিন্দুত্ব ও ইসলাম পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাড়ায় । রক্ষণশীল উলেমাগণ সুলতানদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে কঠোর হিন্দু-বিরোধী নীতি গ্রহণের জন্য। বাস্তববাদী সুলতানগণ তা মানেননি। অপরদিকে কট্টরপন্থী হিন্দুগণ মুসলমানদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। বহুশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিকতা বিরোধিতা, এসব প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও স্থাপত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধীরগতিতে এক সমন্বয়ী প্রক্রিয়া শুরু হয়। সমন্বয়ধর্মী ভক্তি আন্দোলন ও সুফীবাদের প্রভাবে এই প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়। প্রভুশক্তির অধিকারী মুসলমানের সঙ্গে সুলতানভেদে বা অঞ্চলভেদে সঙ্ঘাতের ইতিহাসকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনই একটি সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অস্তিত্বও যে ছিল তা সর্বজনগ্রাহ্য।

উন্নতমানের হিন্দু সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ

বাস্তববাদী সুলতানগণ হিন্দু বিদ্বেষী হননি

বহুশ্বরবাদ-একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা—পৌত্তলিকতা বিরোধিতা

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সমন্বয়

হিন্দুত্ব ও ইসলাম, এই দুই সমৃদ্ধ কিন্তু স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবে সুলতানী শাসনকালে এর নবসংস্কৃতি, বিশেষ করে এক নতুন স্থাপত্যরীতির উন্মেষ ঘটে। এই রীতির গঠনে হিন্দু না মুসলমান, কোনো প্রতিভার অবদান কতটা এ প্রশ্নে শিল্প-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। ফার্গুসন সুলতানী যুগের স্থাপত্যকে 'ইন্দো-সারাসেনিক' নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এটি ছিল ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির 'ভারতীয় সংস্করণ।' কিন্তু হ্যাভেল মন্তব্য করেছেন, সুলতানী স্থাপত্যের 'আত্মা ও দেহ' ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। অর্থাৎ এটি ছিল হিন্দু স্থাপত্যরীতিরই কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। জন মার্শাল মনে করেন, এই রীতি ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির ভারতীয় সংস্করণও নয়, আবার হিন্দুরীতির পরিবর্তিত রূপও নয়। সুলতানী যুগের ইন্দো-সারাসেনিক বা ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যরীতি উভয় উৎস থেকেই গৃহীত, যদিও গ্রহণের মাত্রা সর্বত্র সমান নয়। তারাচাঁদও মন্তব্য করেছেন, হিন্দু ও মুসলমান উপাদানের সংমিশ্রণে এই নতুন স্থাপত্য রীতির বিকাশ ঘটেছে। মুসলমান সৌধগুলিও যেমন বিশুদ্ধ সীরীয়- মিশরীয়-পারসিক-মধ্য এশিয় রীতিতে নির্মিত ছিল না, হিন্দু সৌধগুলিও বিশুদ্ধ হিন্দুরীতিতে নির্মিত হয়নি। সম্ভবত ইসলাম-সম্মত নয় বলে সুলতানীযুগে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দক্ষিণ-ভারতে বিজয় নগররাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

নতুন স্থাপত্যরীতির উৎস সংক্রান্ত বিতর্ক

ফার্গুসন

হ্যাভেল

মার্শাল

তারাচাঁদ

ভাস্কর্যের অনস্তিত্ব

তুর্কী প্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় রোমিলা থাপার তার বর্ণনা দিয়েছেন। ভারতে এই সময় বহু সংখ্যায় মসজিদ ও সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। মসজিদে বহু মানুষের একত্রে নমাজ পড়ার জন্য বর্গ অথবা আয়তাকার উপাসনাস্থান নির্মাণ করা হত। তিনদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই স্থানটিতে কোনো ছাদ থাকত না। নমাজ পরিচালনার সময় ইমামের বসার স্থলে কিছু গম্বুজ থাকত। মসজিদে প্রথম দিকে একটি ও পরের দিকে চারকোণে চারটি মিনার থাকত। মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন দিনে পাঁচবার আজান দিতেন। গম্বুজগুলি শুধু মসজিদের শোভা বর্ধন করত। সমাধিসৌধগুলিতে চারকোণা অথবা আটকোণা ঘরে কবর থাকত। তার ওপর নির্মিত হত গম্বুজ। তুর্কীশাসকদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পারসিক স্থাপত্যরীতিরও আগমন ঘটে। এই রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান, তির্যক খিলান, গম্বুজ ও গম্বুজের নীচে আটকোণ গৃহ। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যে এ জিনিস ছিল না। কংক্রীটের বেশি ব্যবহারের ফলে ইসলামীয় স্থাপত্যে বেশি স্থান আচ্ছাদন করা সম্ভব হত। রোমিলা থাপার মনে করেন হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ইসলামীয় রীতির মিলন যে সম্ভব হল তার কারণ নির্মাণকার্যে ভারতীয় কারিগর নিয়োগ। পারসিক পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে এই কারিগররা গৃহনির্মাণে অলঙ্করণের জন্য প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। বিভিন্ন আকৃতির পদ্মফুল প্রতীক হিসাবে নতুন গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতীয় প্রতীকের সঙ্গে জ্যামিতিক আকৃতি, লতাপাতায় জড়ানো নকশা ও অক্ষর সম্বলিত ইসলামীয় অলঙ্করণ যুক্ত হয়। এইভাবে দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতে ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

রোমিলা থাপারের অভিমত

নতুন পরিকল্পনার মসজিদ

ইসলামীয় স্থাপত্যে ভারতীয় কারিগর নিয়োগ

(খ) ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য নিদর্শন : ৭১১-৭১২ খ্রীঃ-এ মহম্মদ বিন-কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের পর সেখানে এক ক্ষুদ্র আরব উপনিবেশ গড়ে ওঠে। করাচির কিছু দূরে ভাম্বোর নামে এক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে কিছু ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক মসজিদের নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন ভারতীয় উপমহাদেশে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মামলুক সুলতানদের শাসনকাল থেকে ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের সূচনা। কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীর কিছু মন্দির ধ্বংস করে তার অবশেষ দিয়ে কোয়াৎ-উল-ইসলাম বা 'ইসলামের শক্তি' নামের এক মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটির ইসলামীয় চরিত্র প্রমাণ করার জন্য প্রার্থনা কক্ষের সামনে একটি পাঁচ দরজার তোরণ নির্মাণ করা হয়। তোরণটি ইসলামীয় স্থাপত্যের নিদর্শন হলেও দরজাগুলির ওপরের খিলান গঠনশৈলীর দিক থেকে ভারতীয়। কোয়াৎ-উল-ইসলামের অদূরে কুতুবউদ্দিন একটি মিনার স্থাপন করেন। একে বলা হত মাজানা অর্থাৎ যেখান থেকে আজান দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এর নাম হয় কুতুবমিনার। এই নামকরণের একটি সম্ভাব্য কারণ এটি কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক শুরু হয়েছিল, অপর সুলতান ইলতুতমিস যখন এর নির্মাণকাজ শেষ করেন তখন সুফীসন্ত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি দিল্লীতে বসবাস করতেন ও মিনারটি তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বীকৃতস্বরূপ। মিনারে উৎকীর্ণ একটি লেখতে ফজল ইবন আবুল মালি নামটি উৎকীর্ণ হয়েছে। এই নামটি মিনারের দুর্পতির নাকি যিনি এর তত্ত্বাবধানের কাজ করেছিলেন তাঁর নাম, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। পরে কুতুবমিনার একটি বিজয় স্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেকে মনে করেন গজনীতে তৃতীয় মাহমুদ কর্তৃক নির্মিত মিনারের অনুপ্রেরণায় কুতুবমিনারটি নির্মিত। ইলতুতমিস একে চারটি তলে উন্নীত করলে এর উচ্চতা হয় দুশো আটত্রিশ ফুট। বজ্রপাতে মিনারের উপরাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফিরুজ তুঘলক এর সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। কুতুবমিনারের মূল সৌন্দর্য একে বেষ্টন করে

সিন্ধু উপত্যকায় মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

কুতুবউদ্দিন আইবক—কোয়াৎ-উল-ইসলাম ও কুতুবমিনার

কুতুবমিনার-ইলতুতমিস কর্তৃক নির্মাণকাজ সমাপ্ত ফিরুজ তুঘলক কর্তৃক সংস্কার

থাকা ব্যালকনি। মিনারের প্যানেলে সাদা ও লাল বেলেপাথর ব্যবহার করা হয়েছে।

আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া

কুতুবউদ্দিন আইবক আজমীরে অপর একটি সৌধ নির্মাণ করেন যার নাম আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া।

ইলতুতমিস

ইলতুতমিসের রাজত্বকাল থেকে সুলতানীযুগের স্থাপত্যে ইসলামীয় শিল্পরীতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তিনি কোয়াৎ-উল-ইসলাম ও আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়ার সঙ্গে আরও কিছু সংযোজন করেছিলেন। ১২৩১ খ্রীঃ-এ 'সুলতান ঘরী' নামে এক স্থানে ইলতুমিস তাঁর প্রয়াত পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদের সমাধিভবন নির্মাণ করেন। মাটির নীচে পোঁতা একটি আটকোণা কক্ষের ভিতর সমাধিটি অবস্থিত। কক্ষটিকে ঘিরে রয়েছে উঁচু প্রাচীর যার চার কোণে শোভা পাচ্ছে চারটি বুরুজ। সুলতান ঘরীর সমাধিভবন পরবর্তীকালে নির্মিত সমাধিভবনগুলির কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। ইলতুতমিসের নিজের সমাধিভবনে চারকোণা কক্ষটিকে একটি গোলাকার গম্বুজে রূপান্তরিত করা হয়। এই সমাধিভবনের গায়ে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা হয়। কোয়াৎ-উল-ইসলামের অদূরে গিয়াসউদ্দিন বলবনের সমাধিভবন ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুলতান ঘরী

বলবনের সমাধিভবন

আলাউদ্দিন খলজী

পশ্চিম এশিয়া থেকে সেলজুক স্থপতির আগমন

১২৯০ খ্রীঃ-এ খলজী বংশের শাসন শুরু হলে সুলতানী স্থাপত্যশৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত পশ্চিম এশিয়ার সেলজুক সাম্রাজ্য থেকে অনেক শিল্পী ও স্থপতি ভারতে চলে আসেন। ফলে সুলতানী স্থাপত্যের অঙ্গিকে সেলজুক শৈলীর অনুপ্রবেশ ঘটে। খিলানে পদ্মকলি প্রাড়, দেওয়ালের ওপরদিকে অলঙ্কৃত বর্তুল, দেওয়ালের পৃষ্ঠে হেডার ও স্ট্রেচারের ব্যবহার প্রভৃতি এর বৈশিষ্ট্য। এছাড়া খলজী স্থাপত্যে দেখা যায় অশ্বখুরাকৃতি খিলান, বিস্তৃত গম্বুজ, জালিবদ্ধ জানালা, লাল রঙের বেলে পাথরের ওপর মার্বেল বসানো, দেওয়ালের গায়ে আয়তাকার প্যানেল, জ্যামিতিক নক্সা প্রভৃতি। ১৩১১ খ্রীঃ-এ আলাউদ্দিন খলজী কোয়াৎ-উল-ইসলামের দক্ষিণ প্রবেশ পথে আলাই দরওয়াজা নির্মাণ করেন। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় জামায়েতখানা নামে এক মসজিদ নির্মিত হয়। কুতুবমিনারের দ্বিগুণ উচ্চতার এক মিনার নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কুতুবমিনার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে সিরিতে আলাউদ্দিন এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এখন এর আর কোনো চিহ্ন নেই।

স্থাপত্যরীতিতে পরিবর্তন

জামায়েতখানা

সিরিতে নতুন রাজধানী

খলজী স্থাপত্যের লালিত্য ও অলঙ্করণ তুঘলক যুগে ছিল না। লাল বেলেপাথরের স্নিগ্ধতার স্থলে ধূসর পাথরের রূঢ়তা স্থাপত্যমানের অবনমন ঘটায়। নির্দিষ্ট মাপের পাথরের পরিবর্তে ছোটো, বড়ো খণ্ড পাথর দিয়ে দেওয়াল নির্মিত হয়। দেওয়ালে পুরু পলেস্তরার ওপর রং করা হত। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নগর, প্রাসাদ ও দুর্গের সমন্বয়ে দিল্লীর তৃতীয় নগরী তুঘলকাবাদ স্থাপন করেন। একটি উঁচু পথ গিয়াসউদ্দিনের সমাধিভবনের সঙ্গে দুর্গটিকে যুক্ত করেছে। মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীর চতুর্থ নগরী স্থাপন করেন জাহানপনায়। ফিরুজ তুঘলক দিল্লীর পঞ্চম নগরী ফিরুজাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরুজ শাহ কোটলা দুর্গ তাঁরই নির্মিত। বিশাল জলাশয় পরিবেষ্টিত প্রমোদ উদ্যান হাউজ খাস তাঁরই প্রতিষ্ঠা। কালান ও খিরকি মসজিদ ফিরুজ তুঘলকের শাসনকালে নির্মিত। ফিরুজ শাহের প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহানের সমাধিভবনটি দিল্লীর নিজামউদ্দিন অঞ্চলে অবস্থিত। এর অষ্টভুজাকৃতি গঠন পরবর্তীকালের সৈয়দ ও লোদী সমাধি পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছিল।

তুঘলকাবাদ

জাহানপনা

ফিরুজাবাদ

হাউজ খাস

১৩৯৮ খ্রীঃ-এ তৈমুর লঙের আক্রমণের ফলে উত্তরভারতে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার ফলে সুলতানী যুগের স্থাপত্যের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতেও এযুগে কয়েকটি সমাধি ভবন নির্মিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ সুলতান মুবারক শাহ ও মাহমুদ শাহের সমাধিদ্বয়। লোদী বংশীয় সুলতানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্থাপত্যসৃষ্টির পথে অন্তরায়

সৈয়দ ও লোদী যুগ

য় উঠলেও এ যুগের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি প্রাকারবেষ্টিত বাগানের মধ্যে সিকন্দর লোদীর সমাধিভবনটি। এযুগে নির্মিত মসজিদগুলির মধ্যে বড়ো গম্বুজ ও মোথ কি মসজিদ প্রসিদ্ধ।

সুলতানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে যে আঞ্চলিক রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেও স্থাপত্যকলার বিকাশ ঘটে। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরের শার্কী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে স্থাপত্যরীতির উন্মেষ ঘটে তার মধ্যে হিন্দুরীতির প্রভাব স্পষ্ট। অটলাদেবী মসজিদ, জাম-ই-মসজিদ, লালদরওয়াজা মসজিদ প্রভৃতি জৌনপুরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। বাংলাদেশে ইসলামীয় ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। বাংলাদেশের স্থাপত্যে পাথরের চেয়ে ইঁটের ব্যবহার বেশি। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তার বিশালত্ব ও সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া গৌড়ের বড়ো ও ছোটো সোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

আঞ্চলিক রাজ্য

জৌনপুর

বাংলাদেশে

আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম গুজরাতের নিজস্ব শিল্পরীতি ছিল। তুর্কী শাসকগণ এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সুলতান আহমেদ শাহ আহমেদাবাদ শহরে অনেক সৌধ নির্মাণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাম-ই-মসজিদ। সুলতানের সমাধিভবন অপর এক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি। অপর আঞ্চলিক রাজ্য মালবের রাজধানী ধারে আবিষ্কৃত দুটি মসজিদে হিন্দু স্থাপত্যরীতির ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু রাজধানী মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত হলে সেখানে নির্মিত মসজিদ ও সৌধগুলির মধ্যে ইসলামীয় রীতি প্রাধান্য পায়। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল জাম-ই-মসজিদ, হিন্দোলা মহল, জাহাজ মহল ও সুলতান হুসেঙ শাহের সমাধিভবন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল বেলেপাথর ও শ্বেতপাথরে নির্মিত বাজবাহাদুর ও রূপমতীর প্রাসাদ। রাজপুতানায় হিন্দু স্থাপত্যরীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত রাণা কুম্ভের কীর্তিস্তম্ভ ও চৌমুখ মন্দির অপরূপ স্থাপত্য শৈলীর স্বাক্ষর বহন করে।

গুজরাট

মালব

রাজপুতানা

দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে তুর্কী, আরবী, পারসিকও ভারতীয় প্রভাব পড়েছিল। গুলবর্গার জাম-ই-মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদমিনার ও বিদরের মাহমুদ গাওয়ানের মহাবিদ্যালয়ে এই সমন্বয়ী রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। বাহমনী শাসনকালে নির্মিত অনেক সৌধে হিন্দু প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে পারসিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়, আরও পরে বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানগণ নির্মিত সৌধগুলিতে ভারতীয় প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। বিজয়নগরের নৃপতিদের মধ্যে কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে নির্মিত মন্দিরগুলি হিন্দু স্থাপত্যকলার অপরূপ নিদর্শন। বিটলস্বামীর মন্দির এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

গুলবর্গা

বাহমনী

বিজাপুর

বিজয়নগর

সুলতানী শাসনকালে স্থাপত্যে নবশৈলীর উন্মেষ হিন্দু ও ইসলামীয় উভয় প্রভাবের সমন্বয়েই সম্ভবপর হয়। তবে এই নতুন ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির মধ্যে অঞ্চলভেদে তারতম্য ছিল। সমন্বয় যেমন ঘটেছিল, তেমনই সমন্বয়ের মাত্রাও সর্বত্র সমান ছিল না। আঞ্চলিক স্তরে সমন্বয় ঘটেছিল বেশি। সামাজিক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের পাশাপাশি স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ ভারতীয়দের পরবর্তী জীবনধারাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

সমন্বয়ের মাত্রার তারতম্য

দশম অধ্যায়

প্রাচীন ও সুলতানি যুগে ভারতীয় শিল্প (Indian Art during Ancient and Sultani Periods)

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভারতীয় শিল্পকলার প্রাথমিক অধ্যায় (Early Stages of Indian Art) :

■ **হরপ্পা সভ্যতা :** ভারতে শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, ঘরবাড়ি, অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, স্নানাগার, শস্যাগার, পোড়ামাটির তৈরি বিভিন্ন পুরুষ ও নারীমূর্তি, ধাতুনির্মিত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, শিশুদের খেলনা এবং সিলমোহরের উপর অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রাবলী থেকে হরপ্পাবাসীদের শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবলমাত্র এই নয়—সূত্রধর, স্বর্ণকার, মণিকার, গজদন্ত শিল্পী ও তক্ষণ শিল্পী হিসেবেও হরপ্পাবাসী যে দক্ষ ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।[১]

■ **মৌর্য যুগ :** হরপ্পা সভ্যতার পর থেকে মৌর্য যুগের সূচনা পর্যন্ত সময়কালের কোনও শিল্পনিদর্শন আমাদের নজরে আসে নি। ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রকৃত সূচনা হয় মৌর্য যুগ থেকে। *ডঃ বাগচী* ও *অধ্যাপক শাস্ত্রী* বলেন যে, স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে মৌর্য যুগ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।[২] *দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী*-র মতে, সিন্ধু সভ্যতায় স্থাপত্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য—যাকে ভারতীয় সংস্কৃতির কম মূল্যবান অংশ বলা যায় না, তা অশোকের আমল থেকেই শুরু হয়।[৩]

গুরুত্ব

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে (১) পাটলিপুত্রে **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজপ্রাসাদ** সম্পর্কে জানা যায়। মেগাস্থিনিস এই প্রাসাদটির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়েছেন। কাঠের তৈরি সুবিশাল এই প্রাসাদের থামে সোনা-রূপোর পাত লাগানো ছিল এবং এই থামগুলিকে বেষ্টন করে ছিল সোনার তৈরি লতা ও খোদাই করা রূপোর পাখি। (২) পাটলিপুত্রের **দুর্গের প্রাচীরটি** ছিল কাঠের তৈরি। তাতে ৬৪টি সিংহদরজা এবং ৫৭০টি তোরণ ছিল। (৩) **সম্রাট অশোকের প্রাসাদটি** ছিল আরও বিশাল এবং পাথরের তৈরি। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে ভারতে আগত চৈনিক পরিব্রাজক ***ফা-হিয়েন*** এই প্রাসাদটির বিশালতা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন যে, প্রাসাদটি কোনও মানুষের তৈরি নয়, বরং কোনও দানবের কীর্তি। কেবলমাত্র বিশালতা নয়—প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত পাথরের মসৃণতাও এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রাসাদে ব্যবহৃত পাথরগুলি অসম্ভব মসৃণ

রাজপ্রাসাদ

---

[১] বিশদ আলোচনার জন্য তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩ দেখো।

[২] "In architecture and art ..... the age of the Maurya constituted a notable epoch."

[৩] "Indian art and architecture, not the least valuable part of Indian culture, may be said to begin from Asoka inspite of Indus Valley construction."

এবং আয়নার মতো ঝকঝকে। (৪) সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে পাটনা শহরের কাছে **কুমরাহার** নামক স্থানে ওই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং শত স্তম্ভবিশিষ্ট একটি দরবার কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রিক লেখকরা মৌর্য রাজপ্রাসাদকে পারস্যের সুসা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ***ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার***-এর মতে, ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে পাথরের ব্যবহার অশোকের আমল থেকেই শুরু হয়।

মৌর্য স্থাপত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল স্তূপ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে স্তূপ নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল। কোনও বিখ্যাত ঘটনা, পবিত্র স্থান বা কোনও বিখ্যাত সাধু-সন্তের দেহাবশেষ সুরক্ষিত করে রাখার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ও জৈনরা ইট ও পাথর দিয়ে স্তূপ নির্মাণ করত। বৌদ্ধগ্রন্থ '*মহাবংশ*' থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক ৮৪ হাজার বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ করেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ্ এগুলির মধ্যে মাত্র চারশোটি দেখতে পান। বলা বাহুল্য, কালের প্রকোপে আজ এর সামান্যই টিকে আছে। বর্তমান মধ্যপ্রদেশে ভূপালের কাছে *সাঁচি* স্তূপ-টির কথা বলা যায়। সম্রাট অশোকের আমলে স্তূপটি ইট দিয়ে তৈরি হয়। পরবর্তী একশো বছরে এর আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হয় এবং এতে পাথরের ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। অশোকের স্তূপগুলির মধ্যে সাঁচির স্তূপই হল বৃহত্তম। *সারনাথে* রাজর্ষি অশোক-নির্মিত স্তূপ মিলেছে।

স্তূপ

এই যুগের চৈত্যগুলি মৌর্য স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। চৈত্য হল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত কৃত্রিম গুহা বা উপাসনা কক্ষ। এগুলি পাহাড় কেটে নির্মিত হত। *সাঁচি, সারনাথ* এবং গয়ার ষোলো মাইল দূরে *বরাবর পাহাড়ে* অশোক-নির্মিত চৈত্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

চৈত্য

অশোক ও তাঁর পৌত্র দশরথ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসের জন্য পাহাড় কেটে কিছু গুহা-চৈত্য নির্মাণ করেন, যা *বিহার, মঠ* বা *সঙ্ঘারাম* নামে পরিচিত। বরাবর ও নাগার্জুনী পাহাড়ে আবিষ্কৃত এইসব গুহা-চৈত্যগুলি আজীবক সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। সম্রাট অশোকের আমলে বরাবর পাহাড়ে কয়েকটি বিহার বা সঙ্ঘারাম নির্মিত হয়। নাগার্জুনী পাহাড়ের বিহারগুলি নির্মাণ করেন পৌত্র দশরথ। এইসব গুহাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *সুদাম গুহা* এবং *গোপীগুহা*। এই গুহাগুলি কোনও উন্নত মানের স্থাপত্য-কীর্তির নজির নয়—শিল্পীদের আসল দক্ষতা হল গুহার দেওয়ালের মসৃণতা ও পালিশের কাজে। এর দেওয়ালগুলি অতি মসৃণ এবং আয়নার মতো চকচকে। এইসব চৈত্য ও সঙ্ঘারামগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অভিন্ন বলে মনে হয়।

বিহার

মৌর্য শিল্পকলা বা ভাস্কর্যের অসাধারণত্ব প্রকাশিত হয়েছে অশোকের আমলে নির্মিত ধূসর রঙের বেলেপাথরে তৈরি স্তম্ভগুলিতে। বাখিরা, রামপূর্বা, লৌরিয়া নন্দনগড়, রুম্মিনদেই, সারনাথ, সাঁচি, ফারুখাবাদ, সঙ্কাশ্য প্রভৃতি স্থানে অশোকের আমলে প্রায় ত্রিশটিরও বেশি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। এই স্তম্ভগুলি কোনও সৌধ বা স্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবে স্থাপিত হয় নি। এ কারণে এগুলি স্থাপত্যের নয়—ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসেবেই স্বীকৃত। প্রতিটি স্তম্ভের দুটি অংশ—একটি **দণ্ড** (Shaft)

স্তম্ভ

এবং অপরটি *বোধিকা* বা *শীর্ষ* (Capital)। (১) *দণ্ডটি* একশিলা অর্থাৎ একখণ্ড পাথরে নির্মিত। গোলাকার স্তম্ভ নীচ থেকে ক্রমশ সরু হয়ে সোজা উপরে উঠে গেছে। দণ্ডগুলি উচ্চতায় ৩০ থেকে ৩২ ফুট। দণ্ডগুলির নীচের ব্যাস ৩০ থেকে ৩২ ইঞ্চি এবং মাথার ব্যাস ২৫ থেকে ২৭ ইঞ্চি। বৃহত্তম দণ্ডটির ওজন ৫০ টনের মতো। দণ্ডগুলির মসৃণতা ছিল বিস্ময়কর। (২) দণ্ডের উপরে বসানো একটি পৃথক পাথরে তৈরি *বোধিকা* বা *শীর্ষদেশ*। এটিও একটি পৃথক অখণ্ড পাথর। একটি তাম্রকীলক বা তামার খিল দিয়ে দণ্ডের সঙ্গে বোধিকাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লোহার খিল ব্যবহৃত হলে মরচে পড়ে পাথর ফেটে যেতে পারত—সম্ভবত এই কারণেই তামার খিল ব্যবহৃত হয়েছে। (৩) বোধিকার তিনটি অংশ। নীচে ঘণ্টার আকারে ওল্টানো পদ্ম। পদ্মের পাপড়িগুলি তক্ষণ শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। এর উপর গোলাকার বা আয়তাকার একটি মঞ্চ। মঞ্চের চারপাশে লতাপাতা ও পশুপাখির অপূর্ব অলঙ্করণ। এর উপরে স্তম্ভশীর্ষে আছে পশুমূর্তি। পশুমূর্তিগুলির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। স্তম্ভশীর্ষে সিংহ, বৃষ, হস্তি, অশ্ব প্রভৃতি পশুমূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিগুলি ভাস্কর্য-শিল্পের অনন্য নিদর্শন। *স্যার জন মার্শাল* বলেন যে, মঞ্চের উপর স্থাপিত পশুমূর্তিগুলিতে ভাস্কর্য-শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তার সমকক্ষ শিল্পসৃষ্টি পৃথিবীর আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। *ডঃ নীহাররঞ্জন রায়* বলেন যে, অশোক-স্তম্ভের পশুমূর্তিগুলিতে যে সূক্ষ্মতম ও উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শন ফুটে উঠেছে পৃথিবীর কোথাও পশু স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তা লক্ষ করা যায় না।

দুটি অংশ

অশোক-স্তম্ভগুলির মধ্যে সারনাথের স্তম্ভটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর অভিনবত্ব এর বোধিকার রূপকল্পনায়। ৭ ফুট দীর্ঘ এই বোধিকার (১) মঞ্চের গায়ে চারদিকে হস্তি, বৃষ, অশ্ব ও সিংহ—এই চারটি মূর্তি খোদাই করা আছে। প্রতিটি পশুর পাশে খোদাই করা আছে একটি করে চক্র। মঞ্চগাত্রে উৎকীর্ণ চারটি পশু ও চক্রের উপস্থাপনা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মায়াদেবী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে শ্বেতহস্তি দর্শন করেন, তাই বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রতীক হস্তি। বৃষ রাশিতে বুদ্ধের জন্ম। তাই বৃষ বুদ্ধের প্রতীক। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেন। তাই অশ্ব বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের প্রতীক। ধর্মপ্রচারক বুদ্ধের প্রতীক সিংহ। সারনাথের মৃগদাবে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। এই চক্র ধর্মচক্র-প্রবর্তনের প্রতীক। (২) মঞ্চের উপরে আছে পরস্পরের দিকে পিছন করে বসা চারটি সিংহমূর্তি। (৩) সিংহ চতুষ্টয়ের পিঠের উপর রয়েছে প্রস্তর-নির্মিত একটি বিরাট চক্র বা ধর্মচক্র। *স্যার জন মার্শাল* এবং *স্মিথ* এই স্তম্ভটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সারনাথের স্তম্ভ

(১) সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, মৌর্য শিল্পকলার উপর *পারসিক প্রভাব* আছে। এ ব্যাপারে শিল্প-নিদর্শনের পালিশ ও মসৃণতা, স্তম্ভ, স্তম্ভে ব্যবহৃত ওল্টানো পদ্ম, মঞ্চের চারপাশের অলঙ্করণ, মঞ্চের উপর স্থাপিত পশুমূর্তি প্রভৃতির কথা বলা হয়। (২) অনেকে আবার অশোকের আমলের ভাস্কর্যে *গ্রিক প্রভাব* দেখতে পান। এ ব্যাপারে পশুমূর্তির সুডৌল গঠন এবং লতা-পাতার অলঙ্করণের কথা বলা হয়। অনেকে বলেন যে, অশোকের দ্বারা আমন্ত্রিত ব্যাকট্রিক গ্রিক শিল্পীরাই তাঁর আমলের শিল্পগুলির স্রষ্টা। বলা হয় যে, আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানের পর গ্রিক ও

বিদেশি প্রভাব

পারসিক শিল্পরীতির মধ্যে এক সমন্বয় সাধিত হয়। এই সমন্বয়ী শিল্প-আদর্শ পরে ভারতে প্রবেশ করে। (৩) *অধ্যাপক হ্যাভেল*-এর মতে, মৌর্য শিল্পরীতি হল *আর্য-অনার্য শিল্পরীতির* সমন্বয়। মৌর্য শিল্পে কিছু বিদেশি প্রভাব থাকলেও শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ অশোক কর্তৃক পরিকল্পিত। এ কারণে এই শিল্পকে *'দরবারি শিল্প'* বলা হয়। জনসাধারণের সঙ্গে এই শিল্পের কোনও যোগ ছিল না। তাই দরবারের সমৃদ্ধিতে এই শিল্পের সমৃদ্ধি, এবং দরবারের পতনে এই শিল্পের পতন।

■ **শুঙ্গ ও কাণ্ব যুগ :** রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও শিল্পকলার ইতিহাসে এই যুগ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। (১) মৌর্য যুগে শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল মূলত রাজানুকূল্যে। রাষ্ট্রীয় নির্দেশমতো শিল্পী কাজ করতেন—তার স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ ছিল না। শুঙ্গ-কাণ্ব যুগে শিল্পী তার স্বাধীনতা ফিরে পেল। এই যুগে শিল্প আর *'দরবারি শিল্প'* রইল না। (২) মৌর্য যুগের মতোই এ যুগে পাহাড়ের গুহায় চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করা হয়। এই পর্বে পশ্চিম ভারতের বেদসা, ভাসা, কোন্দন, জুন্নার, নাসিক, কার্লে, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে এবং পূর্ব ভারতে ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরিতে বেশ কিছু চৈত্য নির্মিত হয়। অলঙ্করণ ও শিল্প-শৈলীর দিক থেকে মৌর্য যুগ অপেক্ষা এগুলি অনেক উন্নত মানের ছিল। (৩) খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে শুঙ্গদের রাজত্বকালে ভারতে একটি ইটের তৈরি স্তূপ, পাথরের তৈরি রেলিং ও তোরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। (৪) বেসনগর, কৌশাম্বী, ভিটা, গড়হোয়া, আমিন প্রভৃতি স্থানে শুঙ্গ আমলের স্তূপ ও তোরণের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। (৫) বোধগয়ায় বুদ্ধদেবের বোধিলাভের স্থানে এ সময় একটি রেলিং নির্মিত হয়—মন্দির নির্মাণ হয় পরে। (৬) এই যুগের বিভিন্ন রেলিং ও তোরণের গায়ে ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনের নানা কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এগুলি থেকে সমকালীন যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জানা যায়। (৭) সম্রাট অশোকের আমলে সাঁচিতে ইটের তৈরি যে স্তূপটি নির্মিত হয়, শুঙ্গ-কাণ্ব যুগে তার সঙ্গে পাথরের আস্তরণ যুক্ত হয়। এর ফলে এর আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর দীর্ঘকাল পরে এর সঙ্গে রেলিং ও তোরণ যুক্ত হয়। রেলিং ও তোরণের উপর বুদ্ধজীবনের নানা কাহিনি নিয়ে উন্নত মানের ভাস্কর্য রচিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মনির্ভর স্থাপত্যকলার বিভিন্ন রূপ—স্তূপ, চৈত্য ও বিহার (Various Forms of Religion-based Architecture—Stupas, Chaityas and Viharas) :

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প মূলত ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তার যুগে ভারতে প্রচুর *স্তূপ, চৈত্য* ও *বিহার* নির্মিত হয়।

■ **স্তূপ :** স্তূপ হল প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় স্থাপত্যের একটি বিশেষ ধারা। বৌদ্ধগ্রন্থ *'মহাপরিনির্বাণসুত্ত'* অনুসারে বুদ্ধদেব আনন্দকে বলেন যে, রাজাদের মৃত্যু হলে যেমন করা হয়, তেমনই তাঁর মৃত্যু হলে যেন তাঁর দেহভস্মের উপর স্তূপ নির্মাণ করা হয়। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে বুদ্ধের পূর্বেও স্তূপ নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল। বৈদিক রীতি অনুসারে মৃতের দেহভস্ম

স্তূপের উৎপত্তি

শ্মশানের নীচে সমাহিত করা হত। তাই অনেকের মতে বৈদিক শ্মশান থেকেই স্তূপের উৎপত্তি হয়েছে। জৈনরাও এ ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে স্তূপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেবলমাত্র সমাধিক্ষেত্র বা স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে নয়—উপাসনাস্থল এবং চৈত্যগুলিতে উৎসর্গীকৃত বস্তু হিসেবেও স্তূপ গড়ে ওঠে। বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের মতো স্তূপ-নির্মাণও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হতে থাকে। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতেও স্তূপ নির্মাণ করা হয়।

স্তূপ হল ভগবান বুদ্ধদেব বা কোনও সম্মানিত বৌদ্ধ-ভিক্ষুর দেহাবশেষের উপর নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ-বিশেষ। প্রথমে গোলাকার একটি উঁচু ভিত নির্মিত হয়। তার উপর নির্মিত হয় অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। এই গম্বুজ বা স্তূপের ভিত্তির মাঝে একটি ছোটো ঘরে একটি ছোটো পাত্রে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির দেহাবশেষ রাখা হত। একেবারে নীচ থেকে ভিত্তিতে ওঠার জন্য সিঁড়ি নির্মিত হয়। তার সাহায্যে উপাসক বা ভক্তরা ভিত্তিতে উঠে স্তূপের চারদিক পরিভ্রমণ করে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভিত্তির চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকত। বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের প্রতীকরূপে স্তূপের মাথায় কাঠ বা পাথরের তৈরি ছত্র থাকত। অনেকের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে অর্থাৎ মহাজাগতিক প্রতীকরূপে স্তূপের কল্পনা করা হয়েছিল।

গঠন

বৌদ্ধগ্রন্থ *'মহাবংশ'* থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক ৮৪ হাজার বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এইসব স্তূপগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। এর ফলে কোনও স্তূপেরই আদিরূপ পাওয়া যায় নি—ব্যতিক্রম একমাত্র নেপালের একটি স্তূপ। কালের প্রকোপে দু-একটি বাদে প্রায় সব স্তূপই ধ্বংস হয়ে গেছে। (১) বর্তমান মধ্যপ্রদেশে ভূপালের কাছে *সাঁচি* স্তূপ-টির কথা বলা যায়। সম্রাট অশোকের আমলে এই স্তূপটি ইট দিয়ে তৈরি হয়। পরবর্তী একশো বছরে এর আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হয় এবং এতে পাথরের ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এরও একশো বছর বাদে স্তূপটির চারদিকে এগারো ফুট উঁচু রেলিং এবং চারকোণে চারটি তোরণদ্বার নির্মাণ করা হয়। এই তোরণদ্বারগুলি সুশোভিত ভাস্কর্য-কীর্তির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে আছে। এই ভাস্কর্য-কর্মকে "ভারতীয় ভাস্কর্যের সজীব এবং বলিষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে করা হয়।" অশোকের স্তূপগুলির মধ্যে সাঁচি স্তূপই বৃহত্তম। বর্তমানে এর আয়তন হল ১২১.৫ ফুট এবং উচ্চতা ৭৭.৫ ফুট। (২) মধ্যপ্রদেশের *ভারহুত* স্তূপ-টি শুঙ্গ আমলে নির্মিত হয়। এর চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা—তবে এই রেলিং সাঁচি স্তূপের রেলিং-এর মতো কারুকার্যহীন নয়। সেগুলি সুন্দরভাবে খোদাই করা ছিল। (৩) প্রাচীন সিংহলের রাজধানী *অনুরাধাপুর*-এও একটি বৃহৎ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে এটি সাঁচি স্তূপকে ছাড়িয়ে গেছে। *ডঃ ব্যাসাম*-এর মতে, এটি মিশরের কোনও কোনও পিরামিডের চেয়েও বড়ো। (৪) ভারতের স্তূপগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল কুষাণ-রাজ কণিষ্ক-নির্মিত *পুরুষপুর* বা *পেশোয়ারের স্তূপটি*। *ফা-হিয়েন* এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, এটি ছিল 'জম্বুদ্বীপের সর্ববৃহৎ স্তূপ'। (৫) সোয়াট উপত্যকার চকপত নামক স্থানে একটি এবং (৬) পাঞ্জাবের *মানিকিয়ালা*-তে দুটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। (৭) দক্ষিণ

বিখ্যাত স্তূপসমূহ

ভারতেও বেশ কিছু স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত *অমরাবতীর* স্তূপ-টি বিখ্যাত। এর আয়তন সাঁচি স্তূপের চেয়েও বড়ো এবং এর অলঙ্করণও ছিল উন্নত মানের। (৮) অমরাবতী ছাড়াও এই অঞ্চলের *ঘন্টশাল, ভট্টিপ্রোলু, নাগার্জুনকোণ্ডা* প্রভৃতি স্থানে বেশ কিছু স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। (৯) গুপ্ত যুগের স্তূপগুলির মধ্যে সিন্ধুর *মিরপুর খাস অঞ্চল* এবং *সারনাথের ধামেক* স্তূপ-টি উল্লেখযোগ্য।

বড়ো বড়ো স্তূপগুলিকে ঘিরে অনেক সময় ছোটো ছোটো স্তূপ তৈরি হত। এগুলিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেহ সমাহিত করা হত। অনেক স্তূপে প্রার্থনা গৃহ, তীর্থযাত্রীদের থাকার ঘর প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্তূপের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটত।

ক্ষুদ্রকায় স্তূপ

■ **চৈত্য :** বুদ্ধদেবের মূর্তির আবির্ভাব এবং তা উপাসনার পূর্বে বৌদ্ধদের ভক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্তূপ। স্তূপগুলির মতোই পবিত্র স্থান হল চৈত্য। চৈত্য হল বৌদ্ধদের উপাসনালয়—মন্দির-বিশেষ। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, চৈত্য হল বৌদ্ধদের উপাসনার উদ্দেশ্যে নির্মিত কৃত্রিম গুহা। দু-একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে অধিকাংশ চৈত্যই পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সমাবেশের জন্য কাঠের কুটির তৈরি করা হত—চৈত্যগুলি ছিল তারই প্রতিলিপি। পাহাড় কেটে চৈত্য নির্মাণের পিছনে দুটি কারণের উল্লেখ করা হয়। (১) ভারতে সবচেয়ে বেশি চৈত্য নির্মিত হয়েছিল পশ্চিম ভারতে এবং সেখানকার পাহাড়গুলির প্রাকৃতিক উপাদান এ ধরনের নির্মাণ কার্যের উপযোগী ছিল। (২) পর্বতগাত্র চিরস্থায়ী এবং এ কারণে তা দেবতাদের উপযোগী।

চৈত্যের পরিচয়

চৈত্যের আকার ছিল আয়তক্ষেত্রের মতো। এর মধ্যভাগে থাকত একটি বিশ্রামস্থল, যেখানে উপাসনার বস্তু হিসেবে শোভা পেত একটি স্তূপ। এর চারপাশে ছিল স্তম্ভবেষ্টিত ঘোরানো জায়গা—প্রদক্ষিণ পথ। স্তূপ প্রদক্ষিণের জন্য এটি রাখা হয়েছিল। চৈত্যের উপরে ছিল ধনুকাকৃতি ছাদ। স্তূপের বিপরীত দিকে একটি দরজা থাকত। দরজার উপরে থাকত ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মতো দেখতে একটি খিলান করা প্রকাণ্ড গবাক্ষ।

চৈত্যের গড়ন

(১) *সাঁচি, সারনাথ, সোনারি* প্রভৃতি স্থানে অশোক-নির্মিত চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই চৈত্যগুলি স্বাভাবিকভাবে নির্মিত। (২) পাহাড়-কাটা চৈত্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে গয়ার ষোলো মাইল দূরে *বরাবর পাহাড়ের* গিরিগুহাগুলির কথা বলা যায়। এই স্থানের *লোমশঋষি* গুহা ও *সুদামা* গুহা অলঙ্কারবিহীন। (৩) এরই সন্নিকটে *নাগার্জুন* চৈত্যের প্রবেশদ্বারে কিছু ভাস্কর্যের চিহ্ন আছে। (৪) সাতবাহন রাজত্বকালে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে পাহাড় কেটে কয়েকটি চৈত্য নির্মিত হয়। এর মধ্যে পুণার কাছে *ভাজা* নামক স্থানের চৈত্যটি প্রাচীনতম। এর দেওয়ালের দিকে সারি সারি অষ্টকোণবিশিষ্ট স্তম্ভ আছে, যা উপরের কড়িকাঠকে ধরে রেখেছে। (৫) খান্দেশের কাছে *পিতলখোরা* এবং অজন্তার একটি চৈত্যে (১০ নং) এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। (৬) ইতিমধ্যে চৈত্য নির্মাণ-রীতিতে পরিবর্তন আসছিল। *অজন্তার একটি* গুহা (*৯ নং*), *বেদসা, নাসিকের পাণ্ডুলেনা* এবং *কার্লে*-র চৈত্য তার প্রমাণ। কার্লে চৈত্যের

চৈত্যের বিবরণ

পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ ছিল উন্নত মানের। (৭) গুপ্ত যুগে *অজন্তা, ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদ* ও *মধ্যপ্রদেশের বাঘ গুহার* চৈত্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

■ **সঙ্ঘারাম বা বিহার :** সঙ্ঘারাম বা বিহার হল প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এগুলি হল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসস্থান এবং এর নির্মাণ কৌশল ছিল সাধারণ বাড়ির মতো। একটি চতুষ্কোণ সমতল স্থানের চারদিকে ছোটো ছোটো সারিবদ্ধ ঘরের সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠত সঙ্ঘারাম বা বিহার। (১) প্রথমে এর নির্মাণকার্যে কাঠ ব্যবহার হত। (২) পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সঙ্ঘারামগুলির সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কাঠের বদলে ইটের ব্যবহার শুরু হয়। অনেক সময় এই মঠগুলি কয়েক তলবিশিষ্ট অট্টালিকার রূপ নিত। ইষ্টক-নির্মিত এই বিহারগুলি আর টিকে নেই, তবে *সাঁচি, সারনাথ, কাশিয়া, বৈশালি, তক্ষশিলা* প্রভৃতি স্থানে এদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ এবং খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের সূচনা-পর্বের। (৩) পাহাড় কেটে যে সব বিহার নির্মিত হয়, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম হল *বরাবর* ও *নাগার্জুনী* পাহাড়ের গুহাগুলি। বরাবর পাহাড়ের গুহা-মঠগুলি সম্রাট অশোক এবং নাগার্জুনী গুহা-মঠগুলির নির্মাতা হলেন তাঁর পৌত্র দশরথ। এই অঞ্চলের সুদামা ও লোমশমুনি গুহা ব্যতীত সব গুহারই দেওয়াল অতি মসৃণ। এইসব পাহাড়-কাটা বিহারগুলিতে কুঠুরি বা ঘরের সামনে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য বারান্দা থাকত। (৪) এ প্রসঙ্গে *রাজগিরের শোনভাণ্ডার গুহার* কথাও বলা যায়। (৫) উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে *উদয়গিরি* ও *খণ্ডগিরি*-তে ছোটো-বড়ো প্রায় ৩৭টি জৈনগুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে উদয়গিরির দ্বিতল-বিশিষ্ট *রানিগুম্ফা* সঙ্ঘারামটি সর্ববৃহৎ। (৬) গুপ্ত যুগের প্রায় ২০টি বিহার *অজন্তা*-য় পাওয়া গেছে, যদিও বিহারগুলি বিভিন্ন সময়ে নির্মিত। অজন্তার গুহাগুলির বৈশিষ্ট্য হল স্তম্ভযুক্ত হলঘর এবং এদের কয়েকটিতে উপবিষ্ট-বুদ্ধমূর্তি বিদ্যমান। (৭) মধ্যপ্রদেশের *বাঘ গুহায়* বিহারের সংখ্যা ৯টি। এর হলঘরের অনুরূপ অলঙ্করণ আর কোথাও দেখা যায় না। (৮) *ঔরঙ্গাবাদে* ১১টি বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। অজন্তার তুলনায় এগুলির শিল্পোৎকর্ষ অনেক কম। (৯) *ইলোরাতে* ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন তিন সম্প্রদায়েরই বিহার পাওয়া গেছে। এগুলি সম্ভবত গুপ্ত-পরবর্তী যুগের।

সঙ্ঘারামের সূচনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন শৈলীর মন্দির (Temples of Different Styles) :

গুপ্ত-পূর্ব যুগের বেশ কিছু স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য ও বিহারের সন্ধান পাওয়া গেলেও মন্দিরের কিন্তু কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সম্ভবত কাঠ ও বাঁশ প্রভৃতি অস্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরি মন্দিরগুলির পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। গুপ্ত-পূর্ব যুগের কয়েকটি মন্দিরের চিহ্নমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। (১) *জয়পুরের কাছে বৈরাটে* খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের একটি গোলাকার গৃহের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একমাত্র ভিত ছাড়া এর আর কিছু পাওয়া যায় নি। সম্ভবত এটি একটি মন্দির ছিল। (২) *তক্ষশিলার জান্দিয়ালে* আবিষ্কৃত মন্দিরের স্তম্ভদুটিতে গ্রিক স্থাপত্যের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল।

গুপ্ত-পূর্ব যুগের মন্দির

(৩) অষ্টম শতকে *কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরেও* গ্রিক প্রভাব অতি স্পষ্ট। (৪) শক-কুষাণ যুগের এক ধরনের মন্দির পাওয়া গেছে, যার গর্ভগৃহের একাংশ অর্ধবৃত্তাকার। এ ধরনের মন্দির নির্মিত হয়েছিল *তক্ষশিলা, সাঁচি* এবং মথুরার কাছে *শঙ্খ* নামক স্থানে।

গুপ্ত যুগ থেকেই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা হয়। এ সময় থেকে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ইট ও পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। *ডঃ সরসীকুমার সরস্বতী* এ যুগের মন্দিরগুলিকে *পাঁচভাগে* বিভক্ত করেছেন। এই ভাগগুলি হল—

গুপ্ত যুগের পাঁচ ধরনের মন্দির

(১) সমতল ছাদযুক্ত বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির। এ ধরনের মন্দিরের সামনে হালকা ধরনের মণ্ডপ বা বারান্দা থাকত। (২) সমতল ছাদযুক্ত বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির। এখানে গর্ভগৃহের চারদিকে পরিক্রমার জন্য ঢাকা জায়গা থাকত। এর সামনের দিকে থাকত একটি মণ্ডপ। (৩) বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির, যে মন্দিরের মাথায় একটি নিচু শিখর বা ধ্বজা থাকত। (৪) ধনুকাকৃতি ছাদযুক্ত আয়তক্ষেত্রাকার মন্দির, যার পিছনের দিকটি হত অর্ধবৃত্তাকার। (৫) বৃত্তাকার মন্দির, যার চারকোণায় কিছুটা অংশ বেরিয়ে থাকত।

প্রথম তিনভাগের মন্দির পরবর্তীকালের ভারতীয় স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

প্রথম বিভাগ

(১) প্রথম বিভাগের মন্দিরই হল মন্দির স্থাপত্যের প্রধান এবং এটিই হল দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের মন্দিরগুলির ভিত্তি। *সাঁচির বিষ্ণুমন্দির, জব্বলপুরের অন্তর্গত তিগাওয়ার মন্দির* এবং *পূর্ব মালবের এরাণের বরাহমন্দির* এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, সাঁচি ও তিগাওয়ার মন্দির খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত হয়।

দ্বিতীয় বিভাগ

(২) দ্বিতীয় বিভাগের মন্দির হিসেবে মধ্য ভারতের *নাচনা কুঠারার পার্বতী মন্দির, জব্বলপুরের নিকটস্থ ভূমারার শিবমন্দির, দাক্ষিণাত্যের আইহোলের লাদখান মন্দিরের* কথা বলা যায়। *দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামের* ইটের তৈরি মন্দিরটিও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এইসব মন্দিরগুলির মধ্যে ভূমারার শিব-মন্দিরটি উচ্চমানের অলঙ্করণ এবং নির্মাণ-কৌশলের জন্য উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটির চারকোণায় চারটি ছোটো মন্দির আছে। মূল মন্দিরকে ঘিরে এ ধরনের চার মন্দিরের সমাবেশকে ভারতীয় শাস্ত্রে *'পঞ্চায়তন'* বলা হয়।

তৃতীয় বিভাগ

(৩) তৃতীয় বিভাগের মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হল তাদের নিচু শিখর। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে এই ধরনের মন্দিরের প্রচলন শুরু হয়। এই ধরনের মন্দিরের নিদর্শন হিসেবে *দেওগড়ের (ঝাঁসি) দশাবতার মন্দির, ভিতরগাঁও (কানপুর)-এর ইটের তৈরি মন্দির, নাচনা কুঠারার মহাদেবের মন্দির* এবং হিউয়েন সাঙ্-বর্ণিত *বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরটির* কথা বলা যায়। দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরটি প্রস্তর-নির্মিত। ভিতরগাঁও-এর মন্দিরটি ইটের তৈরি। দশাবতার মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর গর্ভগৃহটি বর্গাকার, গর্ভগৃহের চারদিকে চারটি মণ্ডপ আছে এবং প্রত্যেকটি মণ্ডপের সমতল ছাদ চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অনেকের মতে, ভিতরগাঁও-এর মন্দিরটি ইটের তৈরি মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম।

(৪) চতুর্থ ধরনের মন্দিরগুলিতে বৌদ্ধ চৈত্যের স্থাপত্যশৈলী অনুসৃত হয়েছে।

শালাপুর জেলার *তের-এ অবস্থিত কিছু মন্দির* এবং কৃষ্ণা জেলার *চাজারলার কপোতেশ্বর মন্দির* এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই মন্দিরগুলির নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী। এই মন্দিরগুলির আয়তন কিছুটা ছোটো। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত আইহোলের দুর্গা মন্দিরটিও এই বিভাগভুক্ত।

চতুর্থ বিভাগ

(৫) পঞ্চম ভাগের দৃষ্টান্ত হিসেবে কেবলমাত্র একটি মন্দিরের কথাই বলা যায়। বৌদ্ধ স্তূপের পরিকল্পনায় নির্মিত *রাজগৃহের মণিনাগের মন্দিরটি* এর একক উদাহরণ। বিভিন্ন সময়ে অবশ্য মন্দিরটির সংস্কার করা হয়েছে।

পঞ্চম বিভাগ

আলোচ্য মন্দিরগুলি ভারতের মন্দির-স্থাপত্যে দুটি নতুন রীতির সূচনা করে—*নাগর রীতি* ও *দ্রাবিড় রীতি*। এই দুটি রীতিই ছিল এই যুগের ভারতের মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। (১) নাগর রীতির বৈশিষ্ট্য হল এর ভিত-পরিকল্পনা ও শিখর-বিন্যাস। মন্দিরের ভিত হল ক্রশ-আকৃতিবিশিষ্ট এবং শিখর হল রেখ ধরনের। দেওগড়ের দশাবতার মন্দির এবং ভিতরগাঁও-এর মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য দুটি বিদ্যমান। (২) দ্বিতীয় রীতির বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরের ছাদ ক্রমহ্রাসমান থাকের উপর্যুপরি বিন্যাসে নির্মিত। নাচনা কুঠার পার্বতী মন্দির এবং আইহোলের মন্দিরে দ্রাবিড় শৈলীর সূচনা হয়। গুপ্ত যুগেই ভারতের ভবিষ্যৎ মন্দির স্থাপত্যের ভিত্তি রচিত হয়।

নাগর রীতি ও দ্রাবিড় রীতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পের তিনটি শিল্পরীতি (Three Schools of Architecture and Sculpture) :

মৌর্য যুগের পর শুঙ্গ ও কাণ্ব যুগে ভারহুত, বুদ্ধগয়া ও সাঁচি-কে কেন্দ্র করে ভারতীয় শিল্পকলার বিকাশ ঘটতে থাকে। এরপরে শক-কুষাণ যুগে গান্ধার, মথুরা ও অমরাবতী বা বেঙ্গি-কে কেন্দ্র করে তিনটি পৃথক পৃথক শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে, যা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে গুপ্তযুগে ধ্রুপদী শিল্পের মর্যাদা লাভ করে।

■ **(ক) গান্ধার শিল্প :** ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার অঞ্চল অর্থাৎ পেশোয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নগরহর, বামিয়ান, বেগ্রাম, সোয়াট উপত্যকা, ইউসুফজাই এলাকা ও তক্ষশিলাকে কেন্দ্র করে গান্ধার শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিতির ফলে দীর্ঘদিন ধরে পারসিক, গ্রিক, রোমান, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশি জাতিবর্গ এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। এইসব বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে গড়ে ওঠে গান্ধার শিল্প। কুষাণরাই ছিল এই শিল্পের ধারক ও বাহক।

সূচনা

গান্ধার শিল্পের উৎপত্তির কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সন্নিহিত অঞ্চলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শিল্প-উপাদানগুলি পরীক্ষা করে এগুলির সময়কাল স্থির করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী। মনে করা হয় যে, গ্রিক শাসনের অবসানের পর এবং কুষাণদের ক্ষমতা লাভের আগেই গান্ধার শিল্প গড়ে ওঠে। কুষাণদের শাসনকালে, বিশেষ করে কণিষ্কের শাসনকালে এর চরম বিকাশ ঘটে। **ডঃ *নীহাররঞ্জন রায়*-এর** মতে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতক হল এর সূচনাকাল এবং খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ অর্থাৎ পরবর্তী চারশো বছর ধরে এই শিল্পরীতি তার অস্তিত্ব বজায় রাখে।

সময়কাল

গান্ধার শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ও ভারতীয়। বুদ্ধদেবকে উপজীব্য করে এই শিল্প গড়ে ওঠে। শক-কুষাণরা ভারতে এসে মহাযান ধর্মমত গ্রহণ করলে তাদের শিল্প-ভাবনায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়ে। মহাযান ধর্মমতে বুদ্ধের মূর্তিপূজার নিয়ম ছিল। গান্ধার শিল্পীরাই প্রথম বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণ করে। এইসব মূর্তিগুলিতে গ্রিক ও রোমান প্রভাব স্পষ্ট। বুদ্ধের দৈহিক গড়নের মধ্যে গ্রিক রীতি অনুসারে কুঞ্চিত কেশ, সিংহ গ্রীবা, উন্নত স্কন্ধদেশ, মাংসপেশী বহুল বাহু দেখা যায়। এইসব মূর্তিতে বুদ্ধের গায়ে ভারী পোশাক এবং বহুক্ষেত্রেই তিনি গুম্ফ এবং পাগড়ি সম্বলিত। এই মূর্তির সঙ্গে ভারতীয় ধ্যান-ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। শিল্প-বিশেষজ্ঞরা এই মূর্তির স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। *পার্সি ব্রাউন*-এর মতে গান্ধার শিল্পের প্রকরণ ছিল গ্রিক, কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয়। তিনি একে *'গ্রিক-বৌদ্ধ শিল্প'* বলে অভিহিত করেছেন। *ডঃ কুমারস্বামী* একে ভারতীয় বিষয়বস্তুতে প্রযুক্ত গ্রিক শিল্পরীতির দেশীয় প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। *বুকথল* বলেন যে, গান্ধারের বুদ্ধমূর্তি রোম সম্রাট আগস্টাসের মূর্তির সচেতন অনুকরণ মাত্র। এক কথায়, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও গ্রিক শিল্পরীতির সমন্বয়ে গান্ধার শিল্প গড়ে ওঠে।

শিল্পের স্বরূপ

ভারতীয় শিল্পের ধারায় গান্ধার শিল্প ছিল একটি ঢেউ এবং এর স্থায়িত্ব ছিল সাময়িক। (১) *স্যার জন মার্শাল* বলেন যে, বুদ্ধমূর্তির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূর্তিগুলির শিল্পরীতির উন্নতি না করে যান্ত্রিকভাবে তৈরির ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে মূর্তিগুলিতে শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয় নি। মূর্তিগুলি অনেকটা ছাঁচে-ঢালা হয়ে যায়। (২) এই মূর্তিগুলিতে ভারতীয় শিল্পের নমনীয়তা ও আধ্যাত্মিকতা একেবারে অনুপস্থিত ছিল। (৩) সৌন্দর্যের দিক থেকে গান্ধার শিল্প ভারহুত ও সাঁচির স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পের তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। (৪) *মার্শাল* বলেন যে, গান্ধার শিল্প ছিল অনুকরণের অনুকরণ। রোমের শিল্পের অনুকরণ করেছিল তার উপনিবেশগুলি, আর গান্ধার শিল্প ছিল সেই অধঃপতিত ঔপনিবেশিক শিল্পের অনুকরণ। এ কারণে ভারতের মূল শিল্পের উপর তা কোনও ছাপ ফেলতে পারে নি। *ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার* বলেন যে, গান্ধার শিল্প ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি—এ কারণে পরবর্তী ভারতীয় শিল্পের উপর এর কোনও প্রভাব ছিল না বললেই চলে। (৫) পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুগামীরা অবশ্য বলেন যে, গান্ধার শিল্প ছিল প্রথম সার্থক ভারতীয় শিল্প। ভারতীয় বিষয়বস্তুতে পাশ্চাত্য রীতি প্রয়োগের পরীক্ষা গান্ধার শিল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রভাব

■ **(খ) মথুরা শিল্প :** প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে মথুরা নগরী এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত মথুরা নগরী অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। এর ফলে মথুরা নগরীকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ ধরনের সমৃদ্ধশালী শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে। কেবলমাত্র মথুরা নয়—সন্নিহিত *সারনাথ, শ্রাবস্তী* ও *কৌশাম্বী* অঞ্চলেও এই শিল্পরীতির নিদর্শন মিলেছে। এই শিল্প ছিল গান্ধার শিল্পের সমসাময়িক। কুষাণ আমলে এর বিকাশ ঘটলেও এই শিল্পের সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে কণিষ্কের আমল থেকেই মথুরার শিল্পীদের অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধার শিল্প ছিল বিদেশি

সূচনা

ভাবধারায় সমৃদ্ধ। অপরদিকে গান্ধার শিল্পের সমসাময়িক হলেও মথুরা শিল্প ছিল বিদেশি প্রভাবহীন এবং ভারতীয় ঐতিহ্য-পুষ্ট। বলা হয় যে, মথুরা শিল্পের মূল প্রোথিত ছিল ভারতের মাটিতে।

শিল্প-নিদর্শন

মথুরা ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রায় ১৪০টি ভাস্কর্য-নিদর্শন পাওয়া গেছে। এইসব মূর্তিগুলি তৈরি হয়েছিল সিক্রি থেকে আনা লাল ছোপযুক্ত বেলেপাথরে। সমগ্র শিল্পপ্রয়াসের কেন্দ্রে বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বরা থাকলেও, এখানে যথেষ্ট সংখ্যক জৈন তীর্থঙ্কর, যক্ষ এবং বিভিন্ন রাজাদের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য হল স্থূলতা, বিশালতা ও গুরুভার। এখানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সারনাথ যাদুঘরে রক্ষিত কণিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে নির্মিত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটি। এই মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে দশ ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট। দণ্ডায়মান এই মূর্তির পা দুটি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। মূর্তির ডান হাত অভয়মুদ্রায় ডান কাঁধ পর্যন্ত উন্নত, কটিদেশে ন্যস্ত বাঁ হাত দিয়ে পোশাকটি ধরা আছে। ডান কাঁধে কোনও আবরণ নেই। মূর্তিটির দু'পায়ের মাঝে রয়েছে একটি সিংহমূর্তি। ডঃ *সরসীকুমার সরস্বতী* বলেন যে, সিংহমূর্তি দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, মূর্তিটি শাক্যসিংহ বা বুদ্ধদেবের। কৌশাম্বীতেও একই ধরনের আরেকটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। দুটি মূর্তি প্রায় একই ধরনের। কৌশাম্বীর বুদ্ধমূর্তিতে কেবলমাত্র সিংহমূর্তিটি নেই—পরিবর্তে সেখানে আছে একত্রে গ্রথিত পাঁচটি পদ্মের কুঁড়ি এবং একটি প্রস্ফুটিত ফুল।

বুদ্ধমূর্তি

মূর্তির বৈশিষ্ট্য

মথুরায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রতিটি মূর্তি দণ্ডায়মান, গোলাকার, সামনা-সামনি স্থাপিত, মুণ্ডিত মস্তক, গুম্ফহীন, উর্ধ্বাঙ্গ অংশত আবৃত এবং দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত। তাদের ডান হাত অভয় মুদ্রায় উত্থিত এবং বাঁ হাত কটিদেশে স্থাপিত। মূর্তিগুলি উন্নত বক্ষ ও বৃষস্কন্ধ। তাদের উন্মীলিত নেত্রদ্বয় ও স্মিত আননে পার্থিবতার ছাপ স্পষ্ট—আধ্যাত্মিকতার কোনও ইঙ্গিত সেখানে নেই।

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি ছাড়াও এখানে (১) বেশ কিছু জৈন তীর্থঙ্করদের ধ্যানমগ্ন নগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। মহাবীর ছাড়াও তাঁদের মধ্যে আছেন ঋষভদেব, সম্ভবনাথ, নন্দীবিসল প্রমুখ। আকার ও আয়তনের দিক থেকে মূর্তিগুলি ছিল বুদ্ধমূর্তির অনুরূপ। (২) এ ছাড়াও এই অঞ্চলের জৈন মন্দিরে অর্হৎদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত *'আয়ক-পত্ত'* বা *'নিবেদন ফলক'*-গুলি উল্লেখযোগ্য। এগুলি নির্মিত হয়েছিল সম্পূর্ণ দেশীয় রীতিতে।

তীর্থঙ্করদের মূর্তি

কিছু কিছু ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও মথুরা শিল্পে স্থান পেয়েছিল। কোনও বিহার বা মন্দিরের ধনী পৃষ্ঠপোষক, কুষাণ-রাজ বিম কদফিসিস, কণিষ্ক এবং শক-রাজা চষ্টন-এর মূর্তিও এই শিল্পের উপজীব্য হয়েছে। (১) মূর্তিতে বিম কদফিসিস সিংহাসনে উপবিষ্ট, তিনি বুট পরিহিত এবং তাঁর সিংহাসনের দু'পাশে দুটি সিংহমূর্তি। (২) কণিষ্ক-মূর্তিটি দণ্ডায়মান, তাঁর গায়ে ভারী পোশাক, পায়ে বুট, হাতে তরবারি ও দণ্ড, ভঙ্গি বীরত্বব্যঞ্জক, কিন্তু মূর্তিটিতে মস্তক অনুপস্থিত। (৩) শক-ক্ষত্রপ চষ্টনের মূর্তিটিও একই রকমের। এইসব মূর্তিগুলি দেখে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, সামান্য দিনের জন্য হলেও মথুরা শিল্পের উপর মধ্য এশিয় বা শক প্রভাব কাজ করেছিল—তবে

ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়

ভারতীয় ঐতিহ্যই হল এই শিল্পের মূল কথা। (৪) এই অঞ্চলে কিছু স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে যার সম্মুখভাগের ভাস্কর্যে কয়েকটি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি এবং প্রচুর পরিমাণ নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি—সম্ভবত যক্ষিণী ও অপ্সরা মূর্তি খোদাই করা আছে।

উপসংহার

সামগ্রিক বিচারে মথুরা শিল্প ছিল বৌদ্ধশিল্প। সামান্য কালের জন্য গান্ধার শিল্পের কিছু প্রভাব এর উপর পড়লেও এতে মথুরা শিল্পের মৌলিকত্ব নষ্ট হয় নি। পরবর্তীকালে গুপ্ত যুগের শিল্পে এর প্রভাব পড়ে।

■ **(গ) বেঙ্গি (অমরাবতী) শিল্প ঃ** গান্ধার ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে, আর মথুরা ছিল উত্তর ভারতে। এই দুই শিল্পরীতির বৃত্তের বাইরে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপ বা মধ্যবর্তী অঞ্চলে জগ্গয়পেত, অমরাবতী, গোলি, নাগার্জুনিকোণ্ডা প্রভৃতি স্থানে এক নতুন ধরনের শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। অমরাবতী ছিল এই শিল্পের কেন্দ্রস্থল। তাই এই শিল্প *অমরাবতী শিল্প* নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে কৃষ্ণা-গোদাবরী সংলগ্ন স্থানটি বেঙ্গি নামে পরিচিত থাকায় এই শিল্পরীতি *বেঙ্গি শিল্প* নামেও অভিহিত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে এই শিল্পরীতির উদ্ভব ও বিকাশ। এই শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে সাতবাহনদের শাসনকালে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের ফলে এই অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধি, বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনাহীনতা, সাতবাহন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রেরণা এই অঞ্চলে শিল্প বিকাশের কারণ হিসেবে চিহ্নিত। মনে রাখা দরকার যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাগার্জুন এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মকে বেশ জনপ্রিয় করে তোলেন।

সূচনা

শিল্পের বিবরণ

(১) গান্ধার ও মথুরার মতো বুদ্ধদেব ও বুদ্ধমূর্তিই হল এই শিল্পের প্রধান উপজীব্য। এখানে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দু'ধরনেরই বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে, তবে এখানকার বুদ্ধমূর্তির মুখাবয়ব অনেক কোমল। (২) এখানে স্তূপ, চৈত্য ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। স্তূপের রেলিং বা বেষ্টনীতে বেশ কিছু ভাস্কর্য-নিদর্শন মিলেছে। তাতে নর-নারীর মূর্তিগুলি শীর্ণ ও উৎফুল্ল—তাদের অঙ্গভঙ্গি জটিল। (৩) অমরাবতীর শিল্প ছিল অনেক পরিশীলিত। ড. *নীহাররঞ্জন রায়* বলেন যে, অমরাবতীর শিল্প জড় জগৎ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মধ্যে নিমগ্ন ছিল না—সংযম ছিল এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্ত যুগের শিল্পকলা (Gupta Art) ঃ

সূচনা

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক সৃজনশীল অধ্যায়। *স্মিথ* বলেন যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা—এই তিনটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত শিল্পকলার অসাধারণ বিকাশ গুপ্তযুগে ঘটেছিল।[১] পাটলিপুত্র, বারাণসী, মথুরা, উদয়গিরি, ভিলসা, এরাণ, দেওগড় প্রভৃতি স্থানে গুপ্ত শিল্পের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কালের প্রকোপ ও বিদেশি আক্রমণের ফলে এর অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

---

[১] "The three closely allied arts of architecture, sculpture and painting attained an extraordinary high points of achievements."

■ **স্থাপত্য :** গুপ্ত স্থাপত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—পর্বতগুহা-স্থাপত্য ও মন্দির-স্থাপত্য। মূলত বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের উদ্যোগে পাহাড় কেটে গুহা-স্থাপত্য তৈরি হত। গুহা ছিল দু'রকম—চৈত্য এবং বিহার বা সঙ্ঘারাম। মহারাষ্ট্রের অজন্তা, ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদ এবং মধ্যপ্রদেশের বাঘ-এ দু'রকম গুহাই আবিষ্কৃত হয়েছে। অজন্তার মোট আঠাশটি গুহার মধ্যে বেশ কয়েকটি গুপ্ত-পূর্ব যুগের। (১) গুপ্তযুগে নির্মিত গুহাগুলির মধ্যে দুটি চৈত্য এবং এই দুটি চৈত্যতেই বুদ্ধমূর্তি আছে। ইলোরাতে একটিমাত্র চৈত্য মিলেছে। (২) অজন্তায় প্রচুর বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত কুড়িটি গুপ্ত যুগের। বিহারগুলিতে স্তম্ভযুক্ত হলঘর আছে। ছাদকে ধরে রাখার জন্য স্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছিল। বিহারের দেওয়ালগুলির অলঙ্করণ অতি উচ্চমানের। (৩) বাঘ ও ঔরঙ্গাবাদে আবিষ্কৃত বিহারগুলির অলঙ্করণ অজন্তার মতো উন্নত মানের নয়। (৪) গুহা-স্থাপত্য মূলত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রয়োজনে নির্মিত গুহামন্দির একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে নির্মিত উদয়গিরি গুহামন্দিরের কথা বলা যায়।

গুহা-স্থাপত্য

মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ এক নবযুগ। এই আমলের মন্দির-স্থাপত্যের খুব কম নিদর্শনই আজ টিকে আছে। বিভিন্ন লেখমালা এবং সাহিত্যগ্রন্থ—বিশেষ করে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ প্রমুখের বর্ণনা থেকে আমরা এই যুগের উন্নত মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে জানতে পারি। এই যুগেই সর্বপ্রথম স্থায়ী বস্তু অর্থাৎ ইট ও পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ শুরু হয় এবং পাথরের সাহায্যে মন্দির নির্মাণ-সংক্রান্ত শাস্ত্রাদি রচিত হতে শুরু করে। এই যুগে মন্দির-স্থাপত্যে পাঁচ ধরনের রীতি দেখা যায়।[১] *ভটেশ্বর মন্দির, মণিনাগের মন্দির, সাঁচির মন্দির, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, তিগোয়ার বিষ্ণুমন্দির* মন্দির-স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

মন্দির-স্থাপত্য

■ **ভাস্কর্য :** গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য ছিল বিগত কয়েক শতাব্দীর শিল্প-ভাবনার ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতি। গুপ্তযুগে মথুরা ও অমরাবতীর ভাস্কর্যশৈলী একটি পরিণতিতে পৌঁছায় এবং গ্রিক ও রোমান প্রভাবিত গান্ধার শিল্প ভারতীয়ত্ব অর্জন করে। গুপ্তযুগে শিল্পের তিনটি ধারা ছিল। মথুরা, সারনাথ ও পাটলিপুত্র ছিল এই তিনটি ধারার কেন্দ্র।

ন্দা

(১) **মথুরায়** লাল বেলেপাথরে এবং অনেক সময় ঈষৎ হলুদ চুনাপাথরে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-মূর্তি নির্মিত হয়। জামালপুরে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, কাটরায় প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের বুদ্ধমূর্তি, কুশীনগরে প্রাপ্ত পঞ্চম শতকের শায়িত বুদ্ধমূর্তি, এলাহাবাদের কাছে মানকুয়ারে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের মুণ্ডিত মস্তক বুদ্ধমূর্তি উল্লেখযোগ্য। শিল্প সমালোচকদের মতে মথুরার এই মূর্তিগুলিতে কুষাণ যুগের স্থূলতা ও বিশালতা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। (২) সারনাথ রীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে বিদেশি প্রভাবমুক্ত। কেবলমাত্র বুদ্ধমূর্তিই নয়—বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাবলী এখানে শিল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সারনাথে বুদ্ধদেবের প্রথম

রণ

[১] বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৫৬৯-৫৭১ দেখো।

ধর্মপ্রচার বা 'ধর্মচক্র প্রবর্তনের' ঘটনাকে শিল্পের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়েছে। এই মূর্তিটি একটি অসামান্য সৃষ্টি। এর মধ্য দিয়ে বুদ্ধের করুণাময় রূপ ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বেলেপাথরে তৈরি সারনাথে প্রাপ্ত অন্যান্য বুদ্ধমূর্তিগুলি হল গুপ্ত ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এগুলির মধ্যে প্রশান্তি, সন্তোষ ও অপার্থিবতার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। (৩) বৌদ্ধ শিল্পকেন্দ্র **পাটলিপুত্রে** নির্মিত বুদ্ধমূর্তিগুলিতে দেখা যায় সারনাথের আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মানুভূতির সঙ্গে আবেগের উষ্ণতা ও ইন্দ্রিয়ের আবেদন। এখানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাগলপুরের কাছে সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত তাম্রনির্মিত বিশাল বুদ্ধমূর্তি, নালন্দায় প্রাপ্ত বুদ্ধের ধাতব মূর্তি, রাজগীরে মণিয়ার মঠে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি। পাটলিপুত্র শিল্পরীতির উপর মথুরা ও সারনাথের শিল্পপ্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না। (৪) মথুরা, সারনাথ ও পাটলিপুত্র ছিল মূলত বৌদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। এগুলি ছাড়াও উদয়গিরি, ভিলসা, এরাণ, দেওগড়, ভিতরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু অপ্রধান শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রগুলি ছিল মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রিক। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের উদয়গিরিতে বিষ্ণুর বরাহমূর্তি, দেওগড়ের অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুমূর্তি ও শিবের যোগীমূর্তি, ভূমার মন্দিরের সূর্যমূর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

গুপ্ত যুগের শিল্প হল দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। পশ্চিম ভারতের ভাস্কর্য বা মূর্তিগুলি গুরুভার ও কাঠিন্যযুক্ত। অন্যদিকে পূর্ব ভারতের ভাস্কর্য শিল্পে পেলবতা, কৃশতা ও অঙ্গসৌষ্ঠবের মাধুর্য লক্ষণীয়। পূর্ব ভারতীয় শিল্পে সারনাথ এবং পশ্চিম ভারতীয় শিল্পে মথুরা শিল্পের প্রভাব বেশি।

■ **চিত্রকলা :** চিত্রকলার ইতিহাসেও গুপ্তযুগ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কালিদাসের *রঘুবংশম্, মেঘদূতম্* ও *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*-এ ব্যক্তিগত ও রাজকীয় চিত্রশালার উল্লেখ আছে। এই যুগে চিত্রশালা ছিল সংগীতশালার অংশ। সংগীতশালাতে অসংখ্য চিত্র সাজিয়ে রাখা হত। রঘুবংশম্ ও মেঘদূতম্ কাব্যে বসতবাটি ও রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কনের কথা বলা হয়েছে।

কালিদাসের রচনায় উল্লেখ

অজন্তার গুহাগাত্রে গুপ্ত চিত্রকলার অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ করা যায়। অজন্তার ত্রিশটি গুহার মধ্যে পাঁচটি গুহা গুপ্ত যুগের চিত্রকলা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ১৬ এবং ১৭ নং গুহার কয়েকটি চিত্র অসাধারণ। (১) অজন্তার গুহাচিত্রের বিষয়বস্তু বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং জাতকের কাহিনি হলেও এগুলি গরুড়, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, পশুপাখি, নদী, ফুল, রাজা, রাজদরবার, ঋষি, বন, সাধারণ নর-নারী—সবই স্থান পেয়েছে। (২) ১ নং গুহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির চিত্রটি অসাধারণ। মূর্তিটির ডান হাতে শ্বেতপদ্ম এবং মাথায় মণিমুক্তাখচিত মুকুট। মুখমণ্ডল বেদনাহত এবং দৃষ্টি অবনত। (৩) কেবলমাত্র ধর্মীয় ভাবনাই নয়—পার্থিব বিষয়বস্তুও স্থান পেয়েছে অজন্তার চিত্রে। গদিতে শায়িতা নারী, অশ্বপৃষ্ঠে রাজা, রাজকন্যা, রাজদরবারে পারসিক দূতের আগমন—সবই স্থান পেয়েছে অজন্তার চিত্রাবলীতে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ অজন্তা চিত্রাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। (৪) **বাঘ ও মালবের** গুহাচিত্রগুলিতে অজন্তার শিল্পশৈলীর প্রবহমানতা লক্ষ করা যায়। নর-নারীর সুখ-দুঃখ এবং হাসি-কান্নার বাস্তব চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

গুহাচিত্র

চিত্রাঙ্কনের উপকরণ

গুহাচিত্র অঙ্কনের জন্য গুহাগাত্রে একটি পটভূমি তৈরি করা হত। কাদা, গোবর, পাথরের গুঁড়ো এবং কখনও ধানের তুষ মিশিয়ে গুহার গায়ে একটি পুরু আস্তরণ দেওয়া হত। তার উপর দেওয়া হত পাতলা চুনের প্রলেপ। এই প্রলেপ ভিজে থাকতেই এর উপর বিভিন্ন রং আলতোভাবে পালিশ করা হত।

■ **ধাতুশিল্প :** গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি ঘটে। দিল্লির মেহেরৌলির লৌহস্তম্ভে আজও মরচে পড়ে নি। এই যুগের তামা ও ব্রোঞ্জের অসংখ্য মূর্তি এবং বিভিন্ন প্রতিকৃতি-সহ ধাতব মুদ্রাগুলি থেকে শিল্পীদের কারিগরি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পাল ও সেন যুগের শিল্পকলা (Art during Pala and Sena Period) :

পাল-সেন পর্বে শিক্ষা-সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। পাল-সেন রাজারা শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই কারণে এই পর্বে বাংলায় নিজস্ব আঞ্চলিক রীতিতে শিল্পের বিকাশ ঘটে। এই পর্বের শিল্প বলতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে বোঝায়।

■ **স্থাপত্য :** এই যুগের স্থাপত্য বলতে *স্তূপ, বিহার* ও *মন্দির*-কে বোঝায়। চিনা পর্যটকদের বিবরণে বাংলাদেশে অসংখ্য স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালের প্রকোপে সেই স্তূপগুলি আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও যে সব স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলিকে *'নিবেদক স্তূপ'* বলা হয়। ...ছি তীর্থস্থানে আসা দরিদ্র ভক্তরা পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিবেদন-রূপে এইসব ছোটো ছোটো স্তূপ নির্মাণ করতেন। ইট ও পাথর দিয়ে স্তূপগুলি তৈরি হত। স্তূপগুলিকে ঘিরে বেষ্টনী ও তোরণ থাকত এবং এই দুটিই ছিল অলঙ্করণ-বহুল। বাংলার এই স্তূপগুলি ...ারের 'নিবেদক স্তূপ' অপেক্ষা হীন মানের ছিল। (১) পাহাড়পুরে সত্যপিরের ভিটায় এবং বাঁকুড়ার বহুলারায় **ইটের তৈরি** কয়েকটি 'নিবেদক স্তূপ' পাওয়া গেছে। সম্ভবত এগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তৈরি। স্তূপগুলির অভ্যন্তরে বুদ্ধমূর্তির পরিবর্তে বৌদ্ধসূত্র উৎকীর্ণ প্রচুর মাটির সিলমোহর পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ ধর্মমতে এই সূত্রগুলিই ...ধর্মশরীর। (২) ঢাকা জেলার আস্রফপুর গ্রামে আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর ব্রোঞ্জের তৈরি একটি ছোটো স্তূপ পাওয়া গেছে। (৩) রাজশাহি জেলার পাহাড়পুর এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারি গ্রামে এই ধরনের আরও দুটি স্তূপ মিলেছে। (৪) এই যুগের বৌদ্ধ পুঁথিতে ...ও দুই-তিনটি স্তূপের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *'বরেন্দ্রীর ...াপন স্তূপ'* এবং *'তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান স্তূপ'*। চিত্রের এই স্তূপগুলি একই রকম।

প্রথমদিকে বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসস্থান—পরে সেগুলি বিদ্যাচর্চার ...্রে পরিণত হয়। স্তূপের মতো বাংলার বিহারগুলিও ধ্বংস হয়ে গেছে। (১) পাহাড়পুরে খননকার্যের ফলে **সোমপুর মহাবিহারের** ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি নির্মিত হয় ধর্মপালের আমলে। এই মহাবিহারটি ছিল চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও সমান আয়তনের। এর প্রতিটি দিক ছিল ৯০০ ফুট আয়তনবিশিষ্ট। সমগ্র বিহারটিকে বেষ্টন করে ছিল একটি সুবিশাল প্রাচীর। বিহারের সুবিশাল প্রাঙ্গণকে ঘিরে সারি সারি ১৭৭টি ঘর এবং ঘরগুলির সামনে ছিল প্রশস্ত বারান্দা। বিশাল প্রাঙ্গণের

ঠিক কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি সুবিশাল মন্দির। (২) কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড়ে একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত এটি পাহাড়পুরের বিহারের চে বৃহদায়তন ছিল। (৩) এ প্রসঙ্গে কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা বিহার ও মালদহের জগ মহাবিহারের কথা বলা যায়।

বিভিন্ন লিপি ও সাহিত্য উপাদান থেকে জানা যায় যে, এক সময় প্রাচীন বাংলায় অস মন্দির নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির আঘাতে সেইসব ধ্বংস হয়ে গে

মন্দির

(১) পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহারের অভ্যন্তরস্থ সুবিশাল মন্দি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পোড়ামাটির ইট এবং কাদার গাঁথনি তৈরি এই মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫৬.৫ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ৩১৪.৫ ফুট। মন্দিরটি ি পাঁচতলা এবং এর দ্বিতীয় তলে ছিল চারটি গর্ভগৃহ। প্রত্যেকটি গর্ভগৃহের সামনে এব করে মণ্ডপ ছিল। মন্দিরটির মূল পরিকল্পনা ধর্মপালের সময় রচিত হলেও, মন্দিরটি তৈ হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। (২) খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত বেশ ক ভগ্নপ্রায় মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থাপত্য শিল্পে এগুলিকে *'রেখ'* বা *'শিখর দেউল'* ব হয়। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল সামান্য বেঁকে শিখরাকৃতি হয়ে সোজা উপরের দি উঠে গেছে। শিখরের মাথায় আছে চূড়া। পুরুলিয়া জেলায় চারার জৈন মন্দির, বাঁকুড় বহুলারা গ্রামের সিদ্ধেশ্বর মন্দির, দেহর গ্রামের সর্বেশ্বর ও সম্রেশ্বর মন্দির, সুন্দরবনে জটার দেউল এবং বর্ধমান জেলার গঙ্গারামপুরের মন্দির এই ধরনের মন্দিরের উদাহরণ পুরুলিয়ার তেলকুপীতে অন্তত ২৬টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা হত। এর অধিকাংশই ছিল শিবমন্দির। পাহাড়পুরের মন্দিরটি ব দিয়ে বাংলার সব মন্দিরগুলির আয়তন ছিল খুবই ছোটো এবং শিল্পের দিক থেকে এগুলি কোনও অভিনবত্ব বা অলঙ্করণ ছিল না।

■ **ভাস্কর্য :** পাল-সেনযুগে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব রীতি গড়ে ওঠে (১) পাহাড়পুর হল পাল যুগের ভাস্কর্যের ভাণ্ডার। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যে সারনাথের যে স্থা পাল যুগের ভাস্কর্যে পাহাড়পুরেরও সেই স্থান। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ৬৩ ফলক থেকে সে যুগের ভাস্কর্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এগুলিতে রামায়ণ-মহাভার রাধা-কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও লোকায়ত জীবনের নানা কাহিনি ফুটে উঠেছে। (২) এই যুগে শিল্পীরা রাজমহল পাহাড়ের কষ্টিপাথর, পিতল, কাঁসা, অষ্টধাতু, সোনা-রূপা এবং হাতি দাঁত ও কাঠ দিয়েও দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করতেন। মানবমূর্তি নির্মাণ এই যুগের ভাস্কর্যে বৈশিষ্ট্য। এই মূর্তিগুলিতে মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। (৩ বাংলার ভাস্কর্যের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল মৃৎশিল্প। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মন্দিরগাত্র অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে বাংলার লোকায়ত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। (৪) এই যুগে মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রংপুরের বিষ্ণুমূর্তি, ঢাকার চণ্ডীমূর্তি, ফরিদপুর জেলা উজানি গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি, দেওপাড়ার গঙ্গামূর্তি, রাজশাহির সূর্যমূর্তি প্রভৃতি। (৫) প যুগের বিখ্যাত ভাস্কর ছিলেন **ধীতপাল** ও **ধীমান**—পিতা-পুত্র। ধাতুশিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় তাঁরা দক্ষ ছিলেন। এই যুগের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **শূলপাণি, বিষ্ণুভদ্র, কর্ণভদ্র, তথাগতসার, শশীদেব** প্রমুখ।

■ **চিত্রকলা :** প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় চিত্রাঙ্কন-চর্চা প্রচলিত থাকলেও প্রাক্-পাল যুগের চিত্রকলার কোনও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে ভারতে আগত চিনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধবিহারে অবস্থানকালে তিনি বুদ্ধদেবের চিত্র অঙ্কন করেন। বর্তমানে সেইসব চিত্রের কোনও অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে চিত্রকলার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার সবই একাদশ-দ্বাদশ শতকের এবং মূলত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে সেগুলি রচিত। এই পাণ্ডুলিপিগুলি হল *'অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা', 'কারণ্ডব্যূহ'* এবং *'বোধিচর্যাবতার'*। এই পাণ্ডুলিপিগুলি হল মহাযান, বজ্রযান ও তন্ত্রযান ধর্ম-সংক্রান্ত। এই চিত্রগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু একে *'মিনিয়েচার পেন্টিং'* বলা যায় না। চিত্রগুলির ভাব, পরিকল্পনা, রঙের বিন্যাস, রেখার টৌল সবই প্রশস্ত ও দীর্ঘ। চিত্রগুলিতে শূন্যস্থান বিশেষ ছিল না। শূন্যস্থানগুলি লতা-পাতা, ফল-ফুল এবং বিভিন্ন অলঙ্করণ দ্বারা পূর্ণ করা হত। চিত্রগুলিতে রঙের ব্যবহারে নানা কৌশল দেখা গেলেও, অজন্তার মতো রঙের পরিমিত ব্যবহার এখানে নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলা (South Indian Art) :

ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে দক্ষিণ ভারত এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। উত্তর ভারতের মতোই এখানে প্রচুর মঠ, মন্দির ও চৈত্য নির্মিত হয়। কালের করাল গ্রাস এবং বিদেশি আক্রমণে উত্তর ভারতের মন্দির এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও, দক্ষিণ ভারতের শিল্পকীর্তিগুলি আজও অনেকাংশে অক্ষত আছে। দক্ষিণ ভারতের শিল্পের ইতিহাসে পল্লব, চোল, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজন্যবর্গের অবদান অনস্বীকার্য। এই অঞ্চলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এক উন্নত মানের ধর্মাশ্রয়ী শিল্প গড়ে ওঠে।

তুলনা

পল্লব শিল্প (Pallava Art) :

■ **স্থাপত্য :** দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পল্লব আমলের মন্দিরগুলি থেকেই শুরু হয়েছে। পল্লব যুগের এই মন্দিরগুলিতেই প্রথম *দ্রাবিড় শিল্পরীতির* সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দ্রাবিড় রীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই মন্দিরগুলির উচ্চতা পিরামিডের মতো। মন্দিরগুলি বহুতলবিশিষ্ট। সর্বনিম্ন স্তরে গর্ভগৃহ থাকত, প্রতিটি তলেই তার অনুরূপ বিন্যাস লক্ষ করা যায়—তবে প্রতিটি তলেই র আয়তন নিম্নতর তল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। মন্দিরের শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি। শিল্পশাস্ত্রে একে *স্তূপ* বা *স্তূপিকা* বলা হয়। একেবারে নীচের তলায় অবস্থিত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ। এর চারদিকে থাকে একটি বৃহত্তর চতুষ্কোণ আচ্ছাদিত বেষ্টনী, যা 'প্রদক্ষিণ পথ' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে মূল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে স্তম্ভযুক্ত হলঘর, প্রবেশদ্বার বা বড়ো গোপুরম।

দ্রাবিড় রীতি

পল্লব যুগের মন্দিরগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পাহাড়-কাটা মন্দির এবং (২) স্বাধীনভাবে তৈরি মন্দির। (১) পল্লব যুগের প্রথম পর্বের স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি সবই পাহাড় কেটে তৈরি। এই পাহাড়-কাটা স্থাপত্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) পল্লব-রাজ **প্রথম মহেন্দ্রবর্মন**-এর রাজত্বকালে (৬০০-৬২৫ খ্রিঃ) নির্মিত মন্দিরগুলি ছিল

স্তম্ভযুক্ত। পাহাড় কেটে গুহা তৈরি হত এবং ত্রিকোণ বা গোলাকার স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরের ছাদটিকে ধরে রাখা হত। এটি '*মহেন্দ্র রীতি*' নামে পরিচিত। ত্রিচিনোপল্লি, চেঙ্গলপেট এবং আর্কট জেলায় এ ধরনের মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মহেন্দ্র রীতি

মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালের প্রথম দিকের মন্দিরগুলি ছিল অতি সাধারণ ধরনের, কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্পরীতিতে পরিবর্তন আসে এবং মন্দিরের অলঙ্করণও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। এর দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়—বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে তৈরি গুন্টুর জেলার *অনন্তশায়ন মন্দির* এবং উত্তর আর্কট জেলার *ভৈরবকোণ্ডের মন্দির*। অনন্তশায়ন মন্দিরটি চারতলা—এর উচ্চতা ৫০ ফুট। এর স্তম্ভগুলিতে সুন্দর শিল্পকর্ম পরিলক্ষিত হয়। ভৈরবকোণ্ডের মন্দির আরও বড়ো এবং স্তম্ভগুলির অলঙ্করণ উন্নততর।

(খ) প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন-এর রাজত্বকালে (৬২৫-৬৭৫ খ্রিঃ) *মামল্ল রীতি* বা *মহামল্ল রীতি*-র সূচনা হয়। এই রীতির বৈশিষ্ট্য হল পাহাড় কেটে একটি প্রস্তর-খণ্ডে রথের আকৃতিতে মন্দির নির্মাণ। (i) চেন্নাই (মাদ্রাজ) শহরের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে মামল্লপুরমে (মহাবলীপুরম) এ ধরনের সাতটি রথ বা রথমন্দির পাওয়া গেছে। এই রথগুলি পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী ও গণেশের নামাঙ্কিত। এগুলিকে একত্রে '*সপ্ত প্যাগোডা*' বলা হয়। এই রথ বা রথমন্দিরগুলি হল আসলে শিবমন্দির। রথগুলির আয়তন মোটামুটি একই রকম, তবে সর্ববৃহৎ রথটির দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট, প্রস্থ ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা হল ৪০ ফুট। এই শিল্পরীতি *একশিলা* বা *রথশৈলী* নামেও পরিচিত। রথগুলির ভিতরের দিক অসম্পূর্ণ হলেও, এর বাইরের দিক অসাধারণ সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের কাজে পূর্ণ। সমালোচকদের মতে এই রথগুলির মধ্য দিয়ে পল্লব স্থাপত্যের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। (ii) মহামল্ল রীতি অনুসারে পাহাড় খোদাই করে **মণ্ডপ** বা **গুহা** নির্মাণ করা হয়। মামল্লপুরমে এ ধরনের সতেরোটি গুহামন্দির নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে *মহিষমর্দিনী, আদিবরাহ, বরাহ, ত্রিমূর্তি* প্রভৃতি গুহামন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডপগুলি মহেন্দ্রবর্মনের মণ্ডপগুলির তুলনায় উন্নত।

মহামল্ল রীতি

(২) মহামল্ল যুগের পর গুহামন্দির বা রথমন্দিরের পরিবর্তে পাথর দিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ শুরু হল। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে এই রীতির মন্দির তৈরি হত। এই অধ্যায়ের মন্দিরগুলি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত—*রাজসিংহ গোষ্ঠীর* (৭০০-৮০০ খ্রিঃ) *মন্দির* এবং *নন্দীবর্মন গোষ্ঠীর* (৮০০-৯০০ খ্রিঃ) *মন্দির*। **(ক) রাজসিংহ গোষ্ঠীর** মন্দিরের সংখ্যা ছয়। এদের মধ্যে তিনটি মন্দির মামল্লপুরমে—তির মন্দির, ঈশ্বর মন্দির ও মুকুন্দ মন্দির। একটি মন্দির আছে আর্কটের পনমলইয়ে। অন্য দুটি মন্দির হল কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। **(খ) নন্দীবর্মন গোষ্ঠীর** আমলের মন্দিরগুলি আগের পর্যায়ের মতো উজ্জ্বল নয়। মন্দিরের আয়তনও ছোটো। এই মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঞ্চিপুরমের মুক্তেশ্বর ও মতঙ্গেশ্বের মন্দির।

রাজসিংহ গোষ্ঠী ও নন্দীবর্মন গোষ্ঠী

(৩) পল্লব স্থাপত্যের শেষ ধাপ হল *অপরাজিত রীতি*। অপরাজিত পল্লব এই রীতি প্রবর্তন করেন। এই রীতির নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। এই রীতি পল্লব শিল্পকে ক্রমশ চোল শিল্পের নিকটবর্তী করেছিল।

■ **ভাস্কর্য :** ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও পল্লব যুগ ছিল খুবই উন্নত। বলা হয় যে, পল্লব ভাস্কর্য দিয়েই দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের সূচনা। প্রথম পর্বের পল্লব ভাস্কর্যে শেষ দিকের বেঙ্গি ভাস্কর্যের প্রভাব ছিল সমধিক। (১) মামল্লপুরমের রথমন্দিরগুলিতে অঙ্কিত বিভিন্ন দেব-দেবী ও মানবমূর্তিগুলি পল্লব ভাস্কর্যের অসামান্য নিদর্শন। মানবমূর্তিগুলির মধ্যে আছে পল্লব-রাজ সিংহবিষ্ণু, প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ও নরসিংহবর্মনের প্রতিকৃতি। প্রথম দুই রাজার সঙ্গে তাঁদের রানিদের প্রতিকৃতিও এখানে আছে। (২) পল্লব ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল মহাবলীপুরমের *'গঙ্গাবতরণ'* রিলিফটি। এক সময় সমালোচকরা এই রিলিফটিকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করতেন। অধুনা সমালোচকরা বলেন যে, এই রিলিফে *কিরাতার্জুনের* পৌরাণিক কাহিনি বিবৃত হয়েছে। সমুদ্রমুখী পাহাড়ের পুরো একদিক জুড়ে প্রায় ৯০ ফুট লম্বা ও ২৩ ফুট উঁচু এই মহাকাব্যিক রিলিফটি পাহাড়ের গা কেটে খোদাই করা হয়েছে। অসংখ্য মানুষ, জীবজন্তু, দেবতা, অর্ধদেবতা, সন্ন্যাসী—সবই এখানে উপস্থিত। এখানে মূর্তিগুলি সজীব ও স্বাভাবিক। সমালোচকদের মতে পশুর প্রতি এত মমত্ববোধ পল্লব ভাস্কর্য ছাড়া প্রাচ্যের আর কোনও ভাস্কর্যে পাওয়া যায় না। মহাবলীপুরমের এই রিলিফটিকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য বলা হয়। *গ্রেসেইট* বলেন যে, "It is vast picture, a regular fresco in stone, a master-piece of classic art." (৩) পল্লব গুহামন্দিরগুলির দেওয়ালে ভাস্কর্যের কাজও অতুলনীয়। *কৃষ্ণমণ্ডপে* গোপালকের জীবন-কাহিনি, *মহিষমর্দিনী মণ্ডপে* দেবী দুর্গার সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ-দৃশ্য, অনন্তশয্যায় বিষ্ণুর মাথার উপর ছত্র হিসেবে ফণাধারী শেষনাগ, বরাহ অবতারের দৃশ্য প্রভৃতি ভাস্কর্যের দৃশ্য অতুলনীয়। এছাড়া, *বরাহ-গুহার* ভাস্কর্য-মণ্ডিত থামগুলিও অপূর্ব। পল্লব ভাস্কর্যে বেঙ্গির প্রভাব থাকলেও এই প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল। বেঙ্গির তুলনায় পল্লব-মূর্তিগুলি ছিল অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত। অজন্তা-ইলোরার রহস্যঘন অতীন্দ্রিয়তা এবং আলোছায়ার খেলা এখানে অনুপস্থিত।

■ **চিত্রকলা :** এই যুগে চিত্রকলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। (১) **প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের** রাজত্বকালের সূচনায় সিত্তনভাসল-এর জৈন মন্দিরে অপূর্ব চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর আমলের কিছু গুহামন্দির—বিশেষত মামন্দুরে পল্লব শিল্পকলার কিছু নিদর্শন চোখে পড়ে। (২) **দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ**-র আমলে নির্মিত পন্মলই ও কাঞ্চিপুরমের মন্দিরগুলিতেও চিত্রকলার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। পন্মলই মন্দিরের চিত্রকলায় দেখা যাচ্ছে যে, পার্বতী আনন্দের সঙ্গে শিব-নৃত্য প্রত্যক্ষ করছেন। কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দিরের কক্ষগুলিতেও কিছু চিত্র অঙ্কিত আছে। একটি চিত্রে 'সোমস্কন্দ' অর্থাৎ শিব, পার্বতী ও তাঁদের পুত্র স্কন্দ বা কার্তিক আছেন। পাদুকোট্টাই রাজ্যেও পল্লব চিত্রকলার কিছু নিদর্শন লক্ষ করা যায়।[১]

চোল শিল্প (Chola Art) :

■ **স্থাপত্য :** চোল স্থাপত্য-রীতির সঙ্গে পল্লব স্থাপত্য-রীতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। দক্ষিণ ভারতে পল্লবরাই স্থাপত্য শিল্পে দ্রাবিড় রীতির প্রবর্তন করে, এবং চোলদের অধীনেই

১ এ প্রসঙ্গে চতুর্থ (ছ) 'দক্ষিণ ভারত' শীর্ষক অধ্যায়ে পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫ দেখো।

দ্রাবিড় রীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বলা হয় যে, চোল শাসনাধীনে পল্লব স্থাপত্য-রীতির যেমন পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়, তেমনি দক্ষিণ ভারতে এক নতুন ধরনের স্থাপত্য-রীতির উদ্ভব ঘটে। এই নতুন স্থাপত্য-রীতি অনুসারে পল্লবদের মতো পাহাড় কেটে শিল্পকার্য শুরু হয়।

(১) চোল যুগের প্রথম দিকের মন্দিরগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তার গঠনরীতি ছিল মনোরম। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চোল নৃপতি **বিজয়ালয়**-প্রতিষ্ঠিত *চোলেশ্বর মন্দির* এবং **প্রথম পরান্তক**-প্রতিষ্ঠিত *করঙ্গনাথের মন্দির*। প্রথম মন্দিরটির স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ, তল-যুক্ত শিখরদেশ এবং স্তূপিকা পল্লব ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। করঙ্গনাথের মন্দিরটি এই পর্বের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-নিদর্শন। এই মন্দিরের উপাসনাগৃহ এবং মণ্ডপ পল্লব শিল্পের অনুসারী হলেও, এর স্তম্ভগুলি আকারে ও পরিকল্পনায় নতুন। তাই বলা যায় যে, পল্লব উত্তরাধিকার একেবারে অস্বীকৃত না হলেও করঙ্গনাথের মন্দির দ্রাবিড় মন্দির-স্থাপত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। (২) চোল স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে চোল-রাজ **রাজরাজ চোল** (৯৮৫-১০১৪ খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র **রাজেন্দ্র চোল** (১০১২-১০৪৪ খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। (ক) রাজরাজ চোল কর্তৃক নির্মিত তাঞ্জোরের *বৃহদীশ্বর* বা *রাজরাজেশ্বর মন্দির*-টি হল দ্রাবিড় রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর নির্মাণকাল হল ১০০৩ থেকে ১০১০ খ্রিস্টাব্দ। তৎকালীন ভারতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে এটি ছিল সর্ববৃহৎ এবং উচ্চতম। এই মন্দিরটি ৫০০ × ২৫০ ফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই চোদ্দোতল-বিশিষ্ট মন্দিরটির উচ্চতা হল ২০০ ফুট। (খ) রাজেন্দ্র চোল তাঁর নতুন রাজধানী গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরমে (ত্রিচিনোপলি জেলা) ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে এক বিশালাকার *শিবমন্দির* নির্মাণ করেন। তাঞ্জোরের মন্দিরের মতোই এই মন্দির সূক্ষ্ম কারুকার্য-শোভিত অলঙ্কারবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ। (৩) চোল যুগের অন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *তাঞ্জোরের সুব্রহ্মণ্য মন্দির, দারসুরমের ঐরাবতেশ্বর মন্দির* ও *কুম্ভকোনমের মন্দির*। এই মন্দিরগুলির বিশালতা পূর্ববর্তী মন্দিরগুলির মতো নয়, কিন্তু সেগুলি শিল্প-সুষমামণ্ডিত। (৪) চোল মন্দিরগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাদের গগনচুম্বী ও আদ্যন্ত অলঙ্করণ-মণ্ডিত বিশালাকার *গোপুরম* বা সিংহদ্বার। মূল মন্দিরের মতো সেগুলি ছিল বহুতল-বিশিষ্ট এবং সুউচ্চ শিখরযুক্ত। কুম্ভকোনমের মন্দিরের গোপুরমটির শিল্পকর্ম ছিল অসাধারণ। অনেক সময় বিশালায়তন গোপুরমের শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্যের ফলে মূল মন্দিরটিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত। শিল্পবিশেষজ্ঞ ***ফার্গুসন*** বলেন যে, " চোল শিল্পীগণ দানব-সুলভ পরিকল্পনার মণিকারের সূক্ষ্মতা সহকারে রূপদান করেছেন।"[১]

■ **ভাস্কর্য ঃ** ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও চোলযুগ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। (১) পাথরের তৈরি মন্দিরগাত্র, গোপুরম, বিস্তৃত হলঘর এবং মন্দির-সংক্রান্ত বিভিন্ন অট্টালিকায় এই যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে করঙ্গনাথের মন্দির, তাঞ্জোরের শিবমন্দির, গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরমের মন্দির, দারসুরমের ঐরাবতেশ্বর মন্দির এবং কুম্ভকোনমের মন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। (২) পাথর ছাড়াও বিভিন্ন ধাতব মূর্তি নির্মাণে চোল শিল্পীরা দক্ষ ছিলেন। তামা ও পঞ্চধাতুতে অধিকাংশ মূর্তি তৈরি হলেও সিসা

[১] "The Chola artists conceived like giants and finished like jewellers."

ঞ্জের মূর্তি নির্মাণ অজানা ছিল না। পূর্ণগর্ভ ও শূন্যগর্ভ—দু'ধরনের মূর্তি তৈরি হলেও, গর্ভ মূর্তির সংখ্যাই ছিল বেশি। উৎকৃষ্ট মানের মূর্তিগুলি ছিল আয়তনে বড়ো, ওজনে রী এবং সৌন্দর্য ও সরলতায় অনুপম। মূর্তিগুলির দেহ ছিল অনাবৃত ও মসৃণ এবং র্তগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত ছিল একান্তভাবে শিল্পশাস্ত্র-সম্মত। এইসব মূর্তির মধ্যে ব, পার্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ, রাম প্রমুখের পাশাপাশি বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় মূর্তি বং রাজা-রানির মূর্তিও ছিল। এই যুগের মূর্তিগুলির মধ্যে একাদশ-দ্বাদশ শতকে ব্রোঞ্জ-র্মিত *নটরাজ মূর্তি* সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

■ **চিত্রকলা :** চোলযুগে দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অপরিসীম উন্নতি ঘটলেও ত্রশিল্পের তেমন উন্নতি ঘটে নি। এ সত্ত্বেও বিভিন্ন মন্দিরের অভ্যন্তরে চিত্রশিল্পের কিছু ছু নিদর্শন মিলেছে। (১) চোল নৃপতি বিজয়ালয়-প্রতিষ্ঠিত *চোলেশ্বর মন্দিরের* দেওয়ালে হাকাল, দেবী (কালী) এবং নটরাজ শিবের মূর্তি চিত্রিত হয়েছে। এ ছাড়াও সেখানে কিছু ুদ্র চিত্রাবলী মিলেছে। (২) *তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর* বা *বৃহদীশ্বর মন্দিরের* গায়ে শিব-ম্পর্কিত বহু চিত্র মিলেছে—কৈলাসে শিব, নটরাজ শিব, ত্রিপুরান্তক শিব প্রভৃতি। ৩) চোলেশ্বর ও বৃহদীশ্বর মন্দিরের সমসাময়িক তিরুমালাই-এর *লক্ষ্মীশ্বর মন্দিরে* জনধর্ম-সংক্রান্ত বেশ কিছু চিত্র মিলেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : সুলতানি যুগের শিল্পকলা (Art during the Sultani Period) :

ইন্দো-পারসিক শিল্প-স্থাপত্য

■ **ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতির উদ্ভব :** দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে হিন্দু ঃ ইসলামীয় সংস্কৃতি একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। সুলতানি যুগে ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্পকলার আদান-প্রদানের ফলে শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক নতুন ধ্যায়ের সূচনা হয়। এক ধরনের নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, যার নাম *ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি*। ঐতিহাসিক *ফার্গুসন* সুলতানি যুগের শিল্পকলাকে ভারতীয় ও আরবীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা করেছেন। শিল্পবিশেষজ্ঞ *অধ্যাপক হ্যাভেল*-এর মতে লতানি যুগের শিল্প অন্তরে ও বাইরে পুরোপুরি ভারতীয়। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যগুলি র্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। *স্যার জন মার্শাল*-এর মতে, হিন্দু ও মুসলিম প্রতিভার সংমিশ্রণে লতানি যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উদ্ভব হয়, তবে এই মিশ্র শিল্প-স্থাপত্যে কোন সভ্যতার ভাব কতটুকু তা নির্ণয় করা দুরূহ।

সূচনা

হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির সমন্বয়ের পশ্চাতে একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল। ১) দীর্ঘদিন ধরে দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করার ফলে একে অন্যের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। (২) ইরানের সঙ্গে ভারতের শিল্পগত সম্পর্ক বহু দিনের। ইরানীয় শিল্পীরা ভারতীয় শিল্প-ভাবনা দ্বারা বহু পূর্বেই প্রভাবিত হয়েছিল। আরবের তুর্কিদের সঙ্গেও ইরানের যোগ বহু দিনের। তুর্কিরাও ইরানীয় শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তুর্কিদের গরতে আগমনের ফলে দুই সভ্যতার সংমিশ্রণে নতুন যে শিল্পরীতি গড়ে উঠল তা *ইন্দো-*

হিন্দু ও মুসলিম শিল্পরীতির সংমিশ্রণের কারণ

ইসলামীয় বা *ইন্দো-পারসিক* (Indo-Saracenic) শিল্প নামে পরিচিতি লাভ করে। (৩) মুসলিম শাসকেরা হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করে তার মাল-মশলা দিয়ে বহু নতুন প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর ফলে সেগুলিতে হিন্দু ও জৈন প্রভাব দেখা দেয়। (৪) অনেক সময় আবার হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির বা মঠগুলির উপরের অংশ ভেঙে সেখানে ইসলামীয় রীতিতে গম্বুজ তৈরি করে সেগুলিকে মসজিদে পরিণত করা হত। (৫) হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য-শিল্প উভয়ই ছিল অলঙ্কারবহুল ও ভাস্কর্যবহুল। এই কারণেও উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। (৬) সর্বশেষে বলা যায় যে, ইসলামীয় শিল্পরীতিতে দক্ষ শিল্পীর অভাবের জন্য মুসলিম শাসকেরা হিন্দু শিল্পী ও স্থপতিদের নিয়োগ করতে বাধ্য হন। এর ফলেও ইসলামীয় শিল্পরীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটে।

তুর্কিদের আগমনে ভারতীয় শিল্পকলায় নতুন কিছু উপাদান যুক্ত হয় এবং ভারতীয় শিল্পের অবয়ব ও অলঙ্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। (১) ভারতীয় শিল্পীরা কংক্রিটের ব্যবহার জানতেন না। তারা একের পর এক পাথর বসিয়ে দেওয়াল তৈরি করতেন এবং বিম স্থাপন করে শীর্ষদেশ আচ্ছাদিত করতেন। তুর্কিরা প্রাসাদ নির্মাণে চুন, বালি ও জলের মিশ্রণে এক ধরনের আস্তর ব্যবহার করত। তুর্কি আগমনে উত্তর ভারতের স্থাপত্য শিল্পে এই ধরনের আস্তরের ব্যবহার শুরু হয়। (২) হিন্দু স্থাপত্য-রীতিতে গর্ভগৃহ, স্তম্ভ, চূড়া, আয়তাকার প্রবেশদ্বার, অলঙ্করণ প্রভৃতি ছিল। অন্যদিকে মুসলিম শিল্পরীতিতে জাফরির কাজ, গম্বুজ, খিলান, মিনার এবং নানা ধরনের বর্ণময় ও নকশা-করা টালির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ভারতীয় স্থাপত্যে খিলান ও গম্বুজের ব্যবহার তুর্কিরাই শুরু করে। হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল না—যদিও *ডঃ সতীশ চন্দ্র* বলেন যে, খিলান বা গম্বুজের ব্যবহার ভারতীয়দের অজানা ছিল না। (৩) হিন্দুরা মূর্তিপূজা করত ও মন্দিরগাত্রে দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করত। মূর্তিপূজা-বিরোধী তুর্কিরা কোরানের বাণী এবং ফল-ফুলের সর্পিল অলঙ্করণ দ্বারা মসজিদ ও অট্টালিকা শোভিত করত। এই ধরনের অলঙ্করণের কাজে তারা অবাধে হিন্দু বিষয়বস্তু যেমন—পদ্ম, স্বস্তিকা, ঘণ্টাকৃতি পদ্মফুল, বেলকুঁড়ি প্রভৃতি গ্রহণ করেছিল। এইসব নতুন উপাদানের সংযুক্তিতে এবং দুই রীতির মিলনে এক বর্ণময় শিল্পের উন্মেষ ঘটে।

শিল্পে নতুন উপাদান

এই যুগে তিন ধরনের শিল্পরীতি দেখা যায়—(১) হিন্দু-মুসলিম রীতি মিশ্রিত দিল্লির শিল্পরীতি, (২) হিন্দু-মুসলিম রীতি মিশ্রিত বিভিন্ন প্রাদেশিক শিল্পরীতি এবং (৩) মুসলিম প্রভাবমুক্ত হিন্দু শিল্পরীতি।

■ **দিল্লির স্থাপত্য শিল্প : কুতুবউদ্দিন আইবকের** উদ্যোগে ভারতে ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের সূচনা হয়। প্রথমে তিনি তাঁর অনুচরদের জন্য উপাসনাগৃহ নির্মাণে উদ্যোগী হন এবং নতুন গৃহনির্মাণের পরিবর্তে বিজিত হিন্দুদের মন্দির বা গৃহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। *তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে* (১১৯২ খ্রিঃ) জয়লাভ ও দিল্লি বিজয়ের স্মারক হিসেবে তিনি দিল্লিতে *'কোয়াৎ-উল-ইসলাম'* বা 'ইসলামের শক্তি' এবং আজমিরে *'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'* নামে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন। (১) একটি জৈন মন্দির ভেঙে 'কোয়াৎ-উল-ইসলাম' মসজিদটি তৈরি করা হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহটি ভেঙে তার সামনে তিনটি সুদৃশ খিলান জুড়ে দেওয়া হয়। খিলানগুলি সজ্জিত করা হয় কোরানের বাণী এবং বিভিঃ

লতাপাতা-ফুলের অলঙ্করণ দ্বারা। উপাসনা স্থানটি তৈরি করা হয় মন্দিরের পশ্চিমদিকে। মন্দিরের দেওয়ালে এক জায়গায় লেখা আছে যে, কমপক্ষে সাতাশটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে এই মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী সুলতানদের আমলে এই মসজিদের পরিধি বিস্তৃততর হয়। (২) মহম্মদ ঘুরির নির্দেশে কুতুবউদ্দিন আইবক আজমিরে একটি সংস্কৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপরের অংশ ভেঙে মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে একটি গম্বুজ ও মিনার তৈরি করেন। এজন্য এর নাম 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'। দিল্লি ও আজমিরের এই দুটি মসজিদের গঠনশৈলীতে নানা সাদৃশ্য থাকলেও, আজমিরের মসজিদটি আয়তনে বড়ো। (৩) বিখ্যাত সুফি সন্ত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী-র স্মৃতিরক্ষার্থে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবক বিখ্যাত *'কুতুব মিনার'*-এর নির্মাণকার্য শুরু করেন। ইলতুৎমিস এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। চারতলা-বিশিষ্ট এই মিনারটির উচ্চতা ছিল ২২৫ ফুট। পরবর্তীকালে ফিরোজ তুঘলক এটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং এর উচ্চতা হয় ২৪০ ফুট। শিল্পবিশেষজ্ঞ ***ফার্গুসন*** এই স্তম্ভটিকে 'পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও নিখুঁত স্তম্ভ' রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইলতুৎমিস-এর রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পে ইসলামীয় প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। (১) তিনি *'কোয়াৎ-উল-ইসলাম'*ও *'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'*-য় আরও কিছু সংযোজন করেন। (২) তিনি কুতুব মিনারের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন। (৩) কুতুব মিনারের তিন মাইল দূরে ইলতুৎমিস তাঁর প্রয়াত পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদের একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। তার নাম *'সুলতান ঘরি'*। (৪) ইলতুৎমিসের আমলে নির্মিত অন্যান্য সৌধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর স্বনির্মিত *সমাধি ভবন*, বদাউনের *জাম-ই-মসজিদ, হাউস-ই-শামসি* এবং *শামসি ইদগার* প্রভৃতি।

বলবন দিল্লিতে তাঁর (১) *লাল প্রাসাদ* তৈরি করেন। (২) তাঁর সমাধি-সৌধটি ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। (৩) তাঁর আমলে তৈরি কয়েকটি মসজিদ আজও টিকে আছে।

আলাউদ্দিন খলজি-র রাজত্বকালে (১) নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধির উপর নির্মিত *'জামাইত খাঁ মসজিদ'*-এ মুসলিম শিল্পরীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। জনৈক সমালোচকের মতে, এটি ''সম্পূর্ণরূপে মুসলিম ভাবধারা অনুযায়ী নির্মিত ভারতের সর্বপ্রথম মসজিদ।'' (২) তাঁর আমলে নির্মিত উল্লেখযোগ্য সৌধ *'আলাই দরওয়াজা'* ভারতীয় ও মুসলিম শিল্পরীতির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর খিলানগুলি অতি মনোরম। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য ও অলঙ্করণের প্রাচুর্য এই সৌধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (৩) কুতুব মিনারের কয়েক কিলোমিটার দূরে সিরি-তে তিনি তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমানে অবশ্য এর কোনও অস্তিত্ব নেই। এখানে তিনি হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর পাশে সত্তর একর জায়গা জুড়ে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হয়। এর নাম *'হাউজ-ই-খাসবা'* বা *'হাউস-ই-হলালী'*।

তুঘলক আমলে শিল্পের মানে অবনমন ঘটে। **গিয়াসউদ্দিন তুঘলক** (১) দিল্লি শহরের উপকণ্ঠে *তুঘলকাবাদ* নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। (২) যমুনা নদীর স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে এই প্রাসাদের চারদিকে হ্রদ তৈরি করা হয়। (৩) লাল বেলেপাথরে উঁচু বেদির উপর

গিয়াসউদ্দিনের স্বনির্মিত সমাধিটি তৈরি হয়। এই সমাধি-সৌধের গম্বুজ মর্মর পাথরে তৈরি। **মহম্মদ-বিন-তুঘলক** (১) তুঘলকাবাদ শহরে *আদিলাবাদ* নামে একটি দুর্গ তৈরি করেন। (২) তিনি দিল্লির উপকণ্ঠে *'জাহানপনা'* নামে নতুন একটি নগরী নির্মাণ করেন। (৩) তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজধানী দৌলতাবাদেও একটি আসাধারণ দুর্গ ও বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। **ফিরোজ তুঘলক** নির্মাতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাঁর আমলে স্থাপত্যে মুসলিম খিলান ও হিন্দু বিমযুক্ত ছাদের সমন্বয় দেখা যায়। (১) তিনি দিল্লির উপকণ্ঠে *ফিরোজাবাদ* নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি *'ফিরোজ শাহ কোটলা'* নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এ ছাড়াও (২) তাঁর আমলে *ফতেহাবাদ, হিসার ফিরোজ, জৌনপুর* প্রভৃতি নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। (৩) তিনি প্রচুর দুর্গ, সরাইখানা, প্রাসাদ, মসজিদ, জলাশয়, সেতু নির্মাণ করেন। (৪) তাঁর সমাধি একটি উচ্চাঙ্গের স্থাপত্যকীর্তি।

সৈয়দ ও লোদি আমলে শিল্পের মান অনেক নেমে যায়। এই পর্বে শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাসাদ নির্মাণে বিম, ছাদ ও খিলানের অধিকতর সমন্বয়। **সৈয়দ আমলেই খিজির খাঁ ও মুবারক শাহ** যথাক্রমে দিল্লির উপকণ্ঠে *খিজিরাবাদ* ও *মুবারকাবাদ* নামে দুটি শহর গড়ে তোলেন। এই আমলের শিল্পগুলির মধ্যে *মুবারক শাহ* এবং *মহম্মদ শাহের সমাধি* উল্লেখযোগ্য। **লোদি আমলে** স্থাপত্য-রীতিতে পরিবর্তন আসে। তুঘলকদের সরল ও সাদামাঠা শিল্পরীতির পরিবর্তে এ সময় খলজি আমলের জাঁকজমক ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়। ধূসর বেলেপাথরের দেওয়ালের উপর এনামেল করা টালির ছাদ এই পর্বের স্থাপত্যে কিছুটা অভিনবত্বের সৃষ্টি করে। এ সময়ের স্থাপত্যকীর্তির উল্লেখযোগ্য নজির হল *সিকন্দর শাহের সমাধি*-টি।

■ **প্রাদেশিক স্থাপত্য-রীতি :** দিল্লির সুলতানদের মতো বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারাও শিল্পানুরাগী ছিলেন এবং এর ফলে স্থানীয় প্রভাব ও শাসনকর্তাদের নিজস্ব রুচি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের শিল্পরীতির উদ্ভব ঘটে। এগুলির মধ্যে **জৌনপুরী, গুজরাটি ও গৌড়ীয় রীতি** অতি উল্লেখযোগ্য। (১) **জৌনপুর**-এর স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাব অতিরিক্ত, কারণ এখানে হিন্দু মন্দিরগুলিই মূলত মসজিদে রূপান্তরিত হয়। *'অতালা মসজিদ'*-টি জৌনপুরী স্থাপত্যশিল্পের এক অতি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অতালাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। এছাড়া জৌনপুরের *জাম-ই-মসজিদ* এবং *লাল দরওয়াজা মসজিদ* উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন। (২) **গুজরাট**-এর শিল্পরীতিতে এই যুগে হিন্দু প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মুসলিম অনুপ্রবেশের পূর্বেই এখানে এক বিশেষ শিল্পরীতি গড়ে ওঠে এবং মুসলিম শাসকেরা তা অব্যাহত রাখেন। সুলতান আহম্মদ শাহ *আহম্মদাবাদে* যে সব অট্টালিকা নির্মাণ করেন তার অধিকাংশই হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি। রাজধানী আহম্মদাবাদের *জাম-ই-মসজিদের* সূক্ষ্ম কারুকার্য স্থানীয় প্রভাবের একটি সুন্দর নিদর্শন। এছাড়া ক্যাম্বে, ঢোলকা ও ব্রোচে নির্মিত সুদৃশ্য মসজিদগুলির মূলেও আছে ইসলামীয় ও হিন্দু স্থাপত্য-রীতির সম্মিলিত প্রভাব। (৩) **মালব**-এর পুরাতন রাজধানী ধার-এর মসজিদগুলি হিন্দুরীতিতে তৈরি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ থেকে নির্মিত এবং এই কারণে এগুলিতে হিন্দু শিল্পরীতির ছাপ সুস্পষ্ট। এখানে মালব-স্থাপত্যের প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে মালবের নতুন রাজধানী মাণ্ডুতে নির্মিত

স্থাপত্যকীর্তিগুলি দিল্লির ইসলামীয় স্থাপত্যের রীতিতে তৈরি। এগুলির মধ্যে *জাম-ই-মসজিদ, কামাল মৌলা মসজিদ, হিন্দোলা মহল, জাহাজ মহল, কুশক মহল, রূপমতী মহল* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (৪) **বাংলাদেশ**-এর স্থাপত্যশিল্পে পাথরের পরিবর্তে ইট ব্যবহৃত হত। থামের উপর চালার আকৃতির খিলানের ব্যবহার বাংলার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। বাংলার খড়ের চালার আকারে খিলানগুলি তৈরি হত। ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার শাহ নির্মিত পাণ্ডুয়ার *আদিনা মসজিদ* ভারতের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত পাণ্ডুয়ার *একলাখি সমাধি-সৌধ* এবং *গৌড়ের ছোটোসোনা মসজিদ, বড়োসোনা মসজিদ, কদম রসুল* প্রভৃতি বাংলার স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। (৫) দাক্ষিণাত্যের **বাহমনি রাজ্যের** শিল্পকলায় ভারতীয়, মিশর, ইরান ও তুর্কিস্তানের শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায়। গুলবর্গার *জাম-ই-মসজিদ*, দৌলতাবাদের *চাঁদ মিনার*, বিজাপুরে অবস্থিত *মহম্মদ আদিল শাহের স্মৃতিসৌধ, গোল গম্বুজ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

■ **হিন্দু শিল্পরীতি :** ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম বা হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির বিকাশ ঘটলেও চিরাচরিত হিন্দু শিল্পরীতি কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় নি। রাজপুতানা ও বিজয়নগর-এ হিন্দুরীতিতে বহু স্থাপত্যকীর্তি নির্মিত হয়। (১) **বিজয়নগরের** রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের নির্মিত *ভিটলস্বামীর মন্দির*, বিভিন্ন প্রাসাদ ও অট্টালিকা এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রাজাদের তৈরি বিভিন্ন মণ্ডপ ও গোপুরম হিন্দু শৈলীর সাক্ষ্য বহন করে। (২) **রাজপুতানায়** রানা কুম্ভের স্তম্ভ ও দুর্গ এবং রাজন্যবর্গের তৈরি প্রাসাদ হিন্দু স্থাপত্য রীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। (৩) এ প্রসঙ্গে *পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোণারকের সূর্যমন্দির* প্রভৃতির কথা বলা যায়।

সুলতানি আমলে স্থাপত্য-শিল্প
[Architecture during the Sultanate Period]

তুর্কো-আফগান শাসকদের সংস্কৃতি-চেতনা সম্পর্কে প্রাথমিক পর্বের ভারতীয় লেখকদের সাথে আধুনিক গবেষকদের কিছুটা মতভেদ আছে। প্রথমে তুর্কী অভিযানকারীদের অসভ্য বর্বর বলে আখ্যায়িত করার প্রবণতা ছিল। এটা তেমন অস্বাভাবিকও ছিল না। কারণ যে নৃশংসতা, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অত্যাচার দ্বারা তুর্কী-যোদ্ধারা ভারতভূমিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাতে তাদের মধ্যে শিল্পীর উদারতা, সূক্ষ্মতা বা কোমলতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল। আধুনিক গবেষকরা এই মূল্যায়নকে যথার্থ বলে মনে করেন না। *স্যার জন মার্শাল* মনে করেন, মধ্যযুগে এশিয়ার অধিকাংশ যোদ্ধাজাতির মধ্যেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে তুর্কো-আফগান জাতি ইসলামীয় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, একথা কেবল অসত্য নয়, অযৌক্তিকও। তবে ড. *কুরেশী* দিল্লীর সুলতানি রাষ্ট্রকে *'cultural-state'* বলে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। ড. *এ. এল. শ্রীবাস্তব* মনে করেন যে, সুলতানি রাষ্ট্র ছিল 'ধর্মাশ্রয়ী' ; নৃত্য, গীত, ভাস্কর্য বা জীবিত প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ইসলামীয় তত্ত্বে অস্বীকৃত ছিল। স্বভাবতই এই রাষ্ট্রকে এককথায় cultural-state বলা যায় না। তবে তিনিও স্বীকার করেছেন যে, ইসলামীয় শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি তুর্কো-আফগান শাসকদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি লিখেছেন ঃ *"Though primarily a military people our Turko-Afgan rulers patronized Islamic learning and arts."*

তুর্কীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতের শিল্পভাবনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তুর্কীজাতি মধ্য-এশিয়া থেকে পশ্চিম-এশিয়ায় এসে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এবং সেখানকার সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। নবম-দশম শতকে আরবীয় ও পারসিক সভ্যতা চূড়ান্ত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই সকল অঞ্চলে ইসলামের সম্প্রসারণের ফলে স্থানীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে ইসলামের পরিচয় ও আত্তীকরণ ঘটে। তাই তুর্কীরা যখন ভারতে আসে, তখন শিল্প-স্থাপত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল। তবে তুর্কো-আফগান যুগে ভারতে যে স্থাপত্যকলার চর্চা শুরু হয়, তা সম্পূর্ণ বহিরাগত বা ইসলামীয় ছিল না। ভারতে বসবাস শুরু করার পর তুর্কীরা ভারতীয়দের সুপ্রাচীন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত শিল্প-স্থাপত্যের সাথে পরিচিত হয়। তুর্কীদের উপর পারসিক শিল্পের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। আবার সুপ্রাচীন কাল থেকেই পারসিক ও ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে মিল ছিল। কারণ উভয় অঞ্চলেই ছিল আর্য-সংস্কৃতির উপস্থিতি। তাই তুর্কী-শাসনকালে ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যে হিন্দু বা ভারতীয় ধারার সাথে ইসলামীয় ধারার সংমিশ্রণ ঘটে। উভয় ধারার সমন্বয়ে শেষ পর্যন্ত এদেশে এক সমৃদ্ধ শিল্পরীতির বিকাশ হয়। ***অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের*** মতে, *"এই সংমিশ্রণের কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে, বহু উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে। আত্তীকরণ ও সংঘাত দুটোই পাশাপাশি চলেছিল, তবে স্থান ও কাল বিশেষে কোনোটা*

বেশি বা কোনোটা কম।" শেরওয়ানী (H. K. Sherwani) লিখেছেন : *"They (Hindu and the Perso-Turks) could not but be impregnated by each other in their culture and their iedas which are so visibly enshrined in Medieval architecture, art and literature."* যাই হোক, তুর্কী যোদ্ধারা 'পৌত্তলিক' ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতার ভাব দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন এবং ঐতিহ্যশালী হিন্দুশিল্পের অপার্থিব সৌন্দর্য-সুষমা, কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমা ও উদারতার সাথে ইসলামীয় স্থাপত্যের মানসিকতা, ধর্ম ও ভৌগোলিক প্রয়োজনবোধ, ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নবতম শিল্পধারার জন্ম দেন। সুলতানি-আমলের এই শিল্পধারা 'ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য', 'ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্য' বা 'পাঠান-স্থাপত্য' নামে আখ্যায়িত হয়। তবে ফার্গুসন (Fergusson)-এর দেওয়া 'পাঠান' শিল্পধারা নামটিতে অধ্যাপক সরস্বতী (S. K. Saraswati) আপত্তি করেছেন। কারণ সুলতানি-শাসনের সাথে যুক্ত রাজবংশগুলির মধ্যে শুধুমাত্র শেষ বংশটি ছিল পাঠানজাতির প্রতিনিধি।

সুলতানি-আমলের শিল্পধারার সমন্বয়ে বা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রচলিত হিন্দুরীতি এবং নবাগত ইসলামীয়-রীতির মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব বেশি ছিল, সে বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ***হ্যাভেল***-এর মতে, এই শিল্পরীতির শরীর ও মন দুই-ই ছিল ভারতীয়। শিল্প-নিদর্শনে হিন্দু-স্থাপত্যের প্রাধান্যই বেশি। অন্যদিকে ***ফার্গুসন, ভি. স্মিথ*** প্রমুখ মনে করেন, সুলতানি-আমলের শিল্প-স্থাপত্যে হিন্দুরীতির প্রভাব ছিল নেতিবাচক। কিন্তু ***স্যার জন মার্শাল, ড. মজুমদার*** প্রমুখ মনে করেন, ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি কেবল ইসলামীয়-রীতির স্থানীয় (ভারতীয়) রূপ কিংবা হিন্দু-স্থাপত্যের রূপান্তরিত প্রকাশ ছিল না ; এর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পরীতির সাথে মুসলমান অভিযানকারীগণ কর্তৃক বাহিত পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর-আফ্রিকান শিল্পরীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। এই মত সমর্থন করে ***মার্শাল*** লিখেছেন : *"Indo-Islamic architecture derives its character from both sources though not always in equal degrees."* অধ্যাপক মার্শাল মনে করেন, হিন্দু-স্থাপত্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল শক্তি ও সৌন্দর্যের সমান্তরাল প্রকাশ। ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পধারায় হিন্দু-স্থাপত্যের এই বিশিষ্টতার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতির সাথে ইসলামী-রীতির মিলনের কয়েকটি বিশেষ কারণ লক্ষ্য করা যায়। *প্রথমত*, তুর্কীরা ভারতের প্রথমে এসেছিল সামরিক ভাগ্যান্বেষী রূপে। তাদের সাথে দক্ষ কারিগর বা স্থপতি ছিল না। এদেশে কর্তৃত্ব-স্থাপনের পর তারা যখন বাসগৃহ ও উপাসনালয় নির্মাণে উদ্যোগী হয়, তখন তাদের নির্ভর করতে হয় ভারতীয় শিল্পী-কারিগরদের উপর। এই কারিগররা নিজেদের অজান্তে এবং খুব স্বাভাবিক কারণে, পারসিক শিল্পরীতির মাঝে ভারতীয় রীতি ঢুকিয়ে দেয়। যেমন, ভারতীয় প্রতীক পদ্মফুলের সাথে পারসিক নক্‌শা লতাপাতার সর্পিল অলংকরণ একাকার হয়ে যায়। *দ্বিতীয়ত*, মুসলিম শাসকরা প্রথমদিকে অল্পখরচে এবং অল্পসময়ে তাদের প্রয়োজনীয় বাসগৃহ ও উপাসনালয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন হিন্দু বা জৈন মন্দির বা অট্টালিকা। এই সকল নির্মাণের সামান্য পরিবর্তন, যেমন—দেওয়াল ভেঙে কয়েকটি খিলান এবং মাথার উপরে গম্বুজ নির্মাণ করে এগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ফলে সম্পূর্ণ স্থাপত্য-কর্মটির মধ্যে ভারতীয় শিল্পধারা নানা ভাবে বর্তমান থেকে যায়। *তৃতীয়ত*, বিশ্বের কোন দেশের স্থাপত্যে শক্তি ও সৌন্দর্যের এমন সুষম বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি ;—যা ভারতীয় স্থাপত্য-রীতিতে লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান স্থপতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকগণ ভারতীয়-স্থাপত্যের এই অনন্যতাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। তাই ইসলামী শিল্পরীতির মধ্যে বিশেষত স্থাপত্যে, ভারতীয় ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক

সরসীকুমার সরস্বতী মনে করেন, ভারতে সমন্বয়ী আদর্শের জন্যই মুসলমান-শাসিত ভারত অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের তুলনায় উন্নততর স্থাপত্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

তুর্কো-আফগান শাসকদের আমলে ভারতীয় স্থাপত্যের রূপ বা অবয়ব এবং অলংকরণের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আসে। ভারতীয় শিল্পী-কারিগররা কংক্রিটের ব্যবহার জানতেন না। ভারতীয়দের স্থাপত্য-কৌশল ছিল একের পর এক পাথর বসিয়ে দেওয়াল তৈরি করা এবং শীর্ষদেশে বীম স্থাপন করে আচ্ছাদিত করা। কংক্রিট বা চুন, বালি ও জলের মিশ্রণে আস্তর (Mortor) তৈরির কৌশল ভারতীয়দের অজানা ছিল। ফলে প্রশস্ত স্থানের উপর আচ্ছাদন সমন্বিত মন্দির বা প্রাসাদ তৈরি করার কাজে উৎসাহ দেখানো হত না। তুর্কীদের সাথে সাথে ভারতীয় স্থাপত্যে খিলান ও গম্বুজ-এর ব্যবহার শুরু হয়। হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে খিলান বা গম্বুজের অস্তিত্ব ছিল না। সতীশচন্দ্রের মতে, খিলান বা গম্বুজের ব্যবহার ভারতীয়দের অজানা ছিল না ; কিন্তু খিলান তৈরির বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং মর্টার সম্পর্কে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল বলে হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে খিলান বা গম্বুজ ব্যবহার হত না। মুসলমানরা পারস্যে এসে এই বিশিষ্ট স্থাপত্যধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। পারসিক-স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান, তির্যক খিলান, গম্বুজ এবং গম্বুজের নিচে আটকোণ-বিশিষ্ট গৃহ। গম্বুজগুলি ছিল স্থাপতিদের আত্মবিশ্বাস আর মুসলমান শাসকদের দম্ভের প্রতীক। চারকোণ-বিশিষ্ট অট্টালিকার উপর নির্মিত গম্বুজগুলির উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। খিলান আর গম্বুজ ব্যবহারের ফলে বড় বড় উন্মুক্ত হলঘর নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। সমবেত প্রার্থনা কিংবা আলোচনাসভার পক্ষে এই ধরনের কক্ষ খুবই উপযোগী ছিল। কংক্রিটের অধিকতর ব্যবহারের ফলে পারসিক-স্থাপত্যে বেশি জায়গা আচ্ছাদিত করাও সম্ভব হয়েছিল। সুলতানী আমলের স্থাপত্যে খিলান ও গম্বুজের পাশাপাশি প্রস্তরফলক ও বীম-পদ্ধতিও ব্যবহার করা হত।

ভারতীয়দের মত তুর্কীরাও অলংকরণপ্রিয় ছিল। ইসলামধর্মে জীবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অংকন নিষিদ্ধ ছিল। তাই তুর্কীরা গৃহের শোভাবৃদ্ধির জন্য জ্যামিতিক আকৃতি, লতাপাতায় জড়ানো নক্‌শা এবং কোরানের বাণী-সম্বলিত লিপি ব্যবহার করত। এর সাথে তুর্কীরা কিছু সংশোধন-সহ ভারতীয় অলংকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে, যেমন—স্বস্তিকা, পদ্মফুল, ঘণ্টাকৃতি ইত্যাদি। এইভাবে সুলতানি আমলের স্থাপত্যকর্মের নির্মাণ-পদ্ধতি ও অলংকরণের ক্ষেত্রে এদেশে প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতি এবং মুসলমানগণ বাহিত পারসিক শিল্পরীতির অপূর্ব সম্মেলন দেখা যায়। তাই *ঐতিহাসিক দেশাই* (Z. A. Desai) যথার্থই লিখেছেন : *"The Islamic architecture of India is an interesting story of these two seemingly opposite styles mingling with each other with varying degrees in different parts of the country at different periods of time."*

সুলতানি-আমলে 'ইন্দো-ইসলামীয়' স্থাপত্যের উদ্ভব ও বিকাশে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'দাস' ও 'খলজী' বংশীয় সুলতানদের আমলে সৃষ্ট লাহোর, দিল্লির ও আজমীরের স্থাপত্যকর্মগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল তুঘলকদের আমলের কাজগুলি, যেগুলি পূর্বেকার কাজের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং উন্নত ছিল। তুঘলকদের পতনের পর দিল্লী-সুলতানি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বিপন্ন হয়। এই সময়ে শুরু হয় তৃতীয় পর্যায়ের, যখন প্রাদেশিক স্তরে এবং নবনব গঠিত স্বাধীন রাজ্যগুলিতে নতুনভাবে স্থাপত্যকর্ম বিকাশলাভ করে।

কুতুবউদ্দিন আইবকের উদ্যোগে ভারতে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের সূচনা হয়। প্রথমে তিনি অনুচরদের জন্য উপাসনাগৃহ নির্মাণে হাত দেন এবং সম্পূর্ণ নতুন গৃহ-নির্মাণের পরিবর্তে পুরানো

মন্দির বা অট্টালিকাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। তাঁর আমলে নির্মিত এরূপ দুটি প্রাচীনতম নিদর্শন হল দিল্লীর *'কুয়াত-উল-ইসলাম'* মসজিদ এবং আজমীরের *'আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া'* প্রাসাদ। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে একটি জৈনমন্দির ভেঙ্গে *'কুয়াত-উল্-ইসলাম'* মসজিদটি নির্মিত হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহটি ভেঙ্গে তার সম্মুখভাগে তিনটি সুদৃশ্য খিলান তৈরি করা হয়। মন্দিরের পশ্চিমদিকে তৈরি করা হয় উপাসনার স্থানটি। খিলানের সামনে লতা-পাতা-ফুলের সর্পিল অলংকরণ এবং কোরানের বাণী খোদাই করে আকর্ষণ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে সামান্য পরিবর্তনের ছোঁয়া দিয়ে মন্দিরকে পরিণত করা হয় মসজিদে। পরবর্তী সুলতানদের আমলে একটু একটু করে এই মসজিদের পরিধি বিস্তৃত করা হয়। আজমীরে একটি বৌদ্ধমঠ ও সংস্কৃত পাঠকেন্দ্রকে পরিবর্তিত করে *'আড়াই-দিন-কা-ঝোঁপড়া'* অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। মুঘলদের পরাজিত করে মারাঠারা এই অট্টালিকা দখল করে আড়াই দিন বিজয়-উৎসব পালন করেছিল। তারপর থেকে এটি আড়াই-দিন-কা-ঝোঁপড়া' নামে পরিচিত হয়। তবে এই অট্টালিকার নির্মাণে শিল্পীর কল্পনার দৈন্য স্পষ্ট। তাই প্রখ্যাত শিক্ষা-সমালোচক ড. **সরস্বতী** লিখেছেন : *"It was a perfect example of mathematical precision and technical skill ; but in no account it can be regarded as an artistic triumph,"* কিলা-ই-রায়-পিথুরা বা পৃথ্বীরাজ চৌহানের দুর্গকে কেন্দ্র করে কুতুবউদ্দিন যে প্রসাদরাজি নির্মাণ করেন, তাকে Gordon Hearson "মুসলিম শাসকগণ নির্মিত সাতটি নগরের প্রথম সৃষ্টি" বলে বর্ণনা করেছেন। কুতুবউদ্দিন আইবক বিশ্বখ্যাত 'কুতুবমিনার' নির্মাণের সূচনা করেন ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবত প্রখ্যাত সুফীসাধক খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (উচ্-কা-পীর)-এর স্মৃতিরক্ষার্থে এই মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন সুলতান ইলতুৎমিস। ২২৫ ফুট উঁচু এবং চারতলবিশিষ্ট এই মিনারটির চতুর্থতল বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে পড়েছিল। ফিরোজ তুঘলক দু'টি ছোট ছোট তল নির্মাণ করে এর সংস্কার করেন। ফলে উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪০ ফুট। বিশ্বের সুউচ্চ মিনারগুলির মধ্যে অন্যতম এই কুতুবমিনার। শিল্পীর কল্পনা ও নির্মাণ-কৌশল কিংবা ইসলামের বিজয়বার্তার দূত হিসেবে এই মিনার অতুলনীয়। **সতীশচন্দ্র** লিখেছেন : *"কুতুবমিনার নানা কারণে অদম্য। এমন সুকৌশলে সৌধটির অলিন্দগুলি নির্মিত হয়েছে যে, অলিন্দগুলি সৌধ থেকে অভিক্ষিপ্ত হয়েও ছিল সৌধের সাথে যুক্ত। প্যানেলসমূহে এবং মিনারের ঊর্ধ্বে লাল ও সাদা বেলেপাথর এবং মার্বেলের ব্যবহার আর পাঁজরের মত বক্রাকার আকৃতি কুতুবমিনারকে শিল্প-সার্থকতা দান করেছে।"* **ফার্গুসনের** ভাষায় : *"It was the most perfect example of tower known to exist anywhere in the world."*

পারসিক শিল্পধারার এক অসামান্য নিদর্শন হল কুয়াতুল মসজিদের পাশে ইলতুৎমিসের স্বনির্মিত সমাধিসৌধ। এতে তীর্যক খিলানের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ধূসরবর্ণের গ্রানাইটের বহিরঙ্গের উপর লাল বেলেপাথরের ব্যবহার করে এই এককক্ষ-যুক্ত সৌধটিকে রঙ্গীন ও প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাধির ছোট ছোট দেওয়ালগুলিতে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হয়েছিল যে, এক বর্গইঞ্চি জায়গাও খালি ছিল না। ইলতুৎমিসের আমলে নির্মিত অন্য কয়েকটি স্থাপত্যকর্ম হল *'হাউজ-ই-সামসী'*; *'সামসী ইদ্‌গাহ'*; *'জান-ই-মসজিদ্'* ইত্যাদি। রায় পিথুরার দক্ষিণ-পূর্বে নির্মিত সমকোণী ও সগম্বুজ-বিশিষ্ট বলবনের সমাধি-সৌধটি ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পধারার আর একটি ক্ষয়িষ্ণু নিদর্শন।

আলাউদ্দিন খলজি রাজ্যবিজয়ের পাশাপাশি স্থাপত্যসৃষ্টির কাজেও উৎসাহী ছিলেন। কুতুবমিনারকে সম্প্রসারণ করার এক বৃহৎ পরিকল্পনা তাঁর ছিল। অবশ্য সে কাজ তিনি সম্পূর্ণ

করে যেতে পারেন নি। তবে তিনি রাজকীয় চৌহদ্দির প্রবেশদ্বার স্বরূপ সুউচ্চ তোরণ আলাই-দরওয়াজা নির্মাণ করেন, যা *"Treasure Gem of Islamic architecture"* হিসেবে শিল্প-রসিকগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। এই প্রবেশদ্বারের মাথায় একটি সুন্দর গম্বুজ আছে। এর খিলানগুলিও খুব সুন্দর। এই স্থাপত্য-কাজটিতে কারিগরদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আলাউদ্দিন কুতুবমিনারের কয়েক কিলোমিটার দূরে সিরিতে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এখানে তিনি হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট (Mahal Hazar Satun) একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পাশে ৭০ একর জায়গা জুড়ে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করে সুদৃশ্য প্রাচীর দ্বারা তাকে বেষ্টিত করেন। এটি *'হাউজ-ই-খাস বা হাউজ-ই-ইলাহী'* নামে খ্যাত। এইসব স্থাপত্য-কর্মের সামান্য ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে মাত্র। সন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার কাছে 'জামাইত খানা' মসজিদটিও আলাউদ্দিনের আমলে নির্মিত হয়। মার্শালের মতে, এটিই ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসলামীয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারতে নির্মিত প্রথম মসজিদ।

তুঘলকবংশের শাসনকালে দিল্লী-সুলতানি যেমন উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে, তেমনি এই সময়েই সুলতানির পতন সূচিত হয়। তুঘলকদের আমলে সুলতানি-স্থাপত্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। রেখার বাহুল্য বর্জিত হয়। অলংকরণ কমিয়ে দেওয়া হয়। বহিরঙ্গের সৌন্দর্য-সুষমার পরিবর্তে প্রাসাদ বা মসজিদগুলিকে অধিকতর ব্যবহারযোগ্য করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ***অধ্যাপক শ্রীবাস্তবের*** মতে, এই পরিবর্তন দুটি কারণে ঘটেছিল। যথা—(১) তুঘলক শাসকরা ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলিম। তাই ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপত্য-সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন এবং (২) তুঘলকদের রাজকোষ পূর্বের মত সচ্ছল ছিল না, যাতে স্থাপত্যে বেশি অর্থব্যয় করা সম্ভব। স্যার জন মার্শাল আর একটি নতুন কারণ যোগ করেছেন। তাঁর মতে, তুঘলকদের আমলে উন্নত দক্ষ কারিগর ও শিল্পীর অভাব ছিল। ড. সরস্বতী খলজী আমলের সুদৃশ্য স্থাপত্যকর্মের সাথে তুঘলক-আমলের সুদৃঢ় ও বস্তুমুখী স্থাপত্যের তুলনা করে লিখেছেন : *"In marked contrast to the rich and elaborate ornamental style of the Khalji buildings, those of the Tughluqs are characterized by a stark simplicity of design bordering almost on puritanical severity."* ড. সরস্বতী মনে করেন, শক্তি ও কাঠিন্যের প্রতীক তুঘলকী স্থাপত্যে কল্পনার দৈন্য স্পষ্ট।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লীর তৃতীয় নগরী তুঘলকাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। যমুনাদীর তীরে এক উপত্যকার শীর্ষে নির্মিত এই নগরীর সুবৃহৎ প্রাসাদ ও একাধিক অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আজ কেবল অতীত গৌরবের সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে। ***ইবন বতুতা*** লিখেছেন : হয়তো একান্তমনে খুঁজলে আজও সেদিনের সুপ্রশস্ত রাজপথ নজরে পড়বে ; নজরে পড়বে সেই রাজকীয় প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ যার শরীর জুড়ে ছিল সোনালী গিল্‌টি করা টালি ও ইট যার উপর সূর্যালোক পতিত হলে বিচ্ছুরিত আভার দিকে তাকিয়ে থাকা একদা অসম্ভব হত।" গিয়াসউদ্দিনের স্বনির্মিত সমাধি-সৌধটিকেও অনবদ্য স্থাপত্যের নিদর্শন। সুউচ্চ বেদীর উপর পঞ্চভূজ এই সৌধের গম্বুজটি মার্বেলপাথরের নির্মিত হওয়ার পর সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহম্মদ-বিন-তুঘলক *'আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া'* এবং 'সিরি' নগরের মাঝে দিল্লীর চতুর্থ নগরী 'জাহানপনাহ' নির্মাণ করেন এবং সুদৃঢ় দেওয়াল দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় নগরীকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। দৌলতাবাদে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার সূত্রে মহম্মদ তুঘলক নিশ্চয়ই সেখানে বহু প্রাসাদ ও উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন। তবে দ্রুত নির্মাণের জন্য এবং উপযুক্ত মালমসলা ব্যবহার না করার ফলে সেগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি।

ফিরোজ তুঘলক ছিলেন সু-নির্মাতা। তাঁর উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য নগর, প্রাসাদ,

মসজিদ, সরাইখানা, জলাশয়, পুল, ক্যানেল ইত্যাদি। তিনি দিল্লীর 'পঞ্চম নগরী' ফিরোজাবাদ নির্মাণ করেন সিরি'র উত্তরদিকে। এছাড়া ফতেহাবাদ, হিসার-ফিরোজ এবং জৌনপুর শহরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত প্রাসাদ-দুর্গ ও কোটলা-ফিরোজ-শাহ তাঁর আর একগুচ্ছ স্থাপত্যকর্মের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

তুঘলক স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঢালু দেওয়াল। এর ফলে তৎকালীন অট্টালিকাগুলি প্রায় দুর্গের মত শক্ত ও মজবুত হয়েছিল। অলংকরণের ক্ষেত্রে তুঘলকদের নতুনত্ব হল খিলানের সাথে চৌকাঠের সমন্বয়। অর্থাৎ এই সময়ের খিলানগুলি ছিল তীক্ষ্ণ এবং খিলানগুলির তলায় আড়াআড়িভাবে ছিল একটি করে চৌকাঠ, যদিও সেগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা ছিল না।

১৩৯৮-'৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আমীর তৈমুর লঙ-এর আক্রমণ সাধারণভাবে উত্তর-ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং নির্দিষ্ট ভাবে দিল্লী-সুলতানির স্থাপত্যকর্মের উপর বিরাট আঘাত হিসেবে উপস্থিত হয়। মূর্তিমান অভিশাপ তৈমুর ও তাঁর বাহিনীর দাপটে দিল্লীর অধিকাংশ শহর শ্মশানে পরিণত হয়। মানুষের তৈরি স্বর্গীয় শোভাযুক্ত অসংখ্য অট্টালিকা মাটির সাথে মিশে যায়। সৈয়দ বা লোদী বংশীয় সুলতানরা ইচ্ছা থাকলেও সময় ও শক্তির অভাবহেতু স্থাপত্যশিল্পের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের পুনঃস্থাপনা করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য সীমিত রাজনৈতিক ও আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও তাঁরা স্থাপত্যের স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। খিজির খাঁ সৈয়দ এবং মুবারক শাহ যথাক্রমে *'খিজিরাবাদ'* ও *'মুবারকাবাদ'* নামক দু'টি নতুন শহর গড়ে তোলেন। লোদীবংশের আমলে আবার আড়ম্বরপূর্ণ স্থাপত্য সৃষ্টির উদ্যোগ শুরু হয়। তুঘলকদের 'সাদামাটা অথচ সুদৃঢ়' স্থাপত্যের পরিবর্তে এঁরা খলজীদের নয়ন-মনোহর স্থাপত্য-নির্মাণে উৎসাহ দেখান। এই সময় দুই গম্বুজবিশিষ্ট বহু মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ধূসর বেলেপাথরের দেওয়ালের উপর এনামেল-করা টালির ছাদ এই সময়ের স্থাপত্যকে কিছুটা অভিনবত্ব দেয়। *'বড়ে খাঁন'*, *'ছোটে খান'*, *'মঠ-কা-মসজিদ'* প্রভৃতি শেষপর্বে নির্মিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। *স্যার জন মার্শালের* মতে, *"মঠ-কা-মসজিদটি ছিল শেষপর্বের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্যসৃষ্টি।"* লোদীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই স্থাপত্যে শিল্পীদের কল্পনার স্বাধীনতা, নক্সার বৈচিত্র্য, আলো-ছায়ার অপূর্ব সমন্বয় এবং রেখা ও রং-এর অপূর্ব সাযুজ্য লক্ষণীয়। এই মসজিদের সৌন্দর্য ও অভিব্যক্তির প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন : *"The mosque epitomises in itself all that is best in the architecture of the Lodies ; and displays a freedom of imagination, a bold diversity of design, on appreciation of constrasting light and shade and a sense of harmony in line and colour which combine to make it one of the most spirited and picturresque buildings of its kind in the whole range of Islamic art."*

দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সূত্রে যেমন একাধিক আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে, তেমনি ঐ সকল আঞ্চলিক রাজ্যের নিজস্ব স্থাপত্য-রীতিও গড়ে উঠে। দিল্লীর সুলতানদের স্থাপত্যকর্মের মত এত বিশাল ও ব্যাপক না হলেও, ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যধারার নিদর্শন হিসেবে এদের গুরুত্ব কম নয়। এইসব আঞ্চলিক স্থাপত্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্যরীতির প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। স্থানীয় উপকরণ এবং শিল্পী-কারিগরদের সহায়তায় গড়ে-উঠা এইসকল স্থাপত্যকর্মেও শিল্পীদের নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশ, জৌনপুর, গুজরাট, মালব ও দক্ষিণ-ভারতের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যে স্থানীয় স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আজও কালের সাক্ষী হয়ে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের স্থাপত্যে পাথরের পরিবর্তে ইটের ব্যবহার হত বেশি। কারণ সেখানে পাথর সহজলভ্য ছিল না। চারকোণবিশিষ্ট ছোট ছোট [illegible] উপর কাটিদালা সদৃশ বক্র কার্নিশযুক্ত হিন্দু-স্থাপত্যের সাথে তির্যক খিলানের সমন্বয়ে

এখানে একাধিক মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশে ইন্দো-ইসলামীয় রীতিতে নির্মিত প্রাচীনতম স্থাপত্যকর্মটি হল হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে স্থাপিত মসজিদ ও সৌধ। এছাড়া, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, একলাখী মসজিদ, গৌড়ের দাখিলি দরওয়াজা, কদম রসুল, বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, লোটন মসজিদ ইত্যাদি বঙ্গীয় রীতিতে নির্মিত ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে আজও বর্তমান।

হিন্দু ও মুসলিম ধারার সমন্বয়ে জৌনপুরেও ব্যাপক স্থাপত্যচর্চা হয়েছিল। ড. **ঈশ্বরীপ্রসাদ** লিখেছেন : *"জৌনপুরের সুলতানেরা (শার্কীবংশ) শিক্ষা ও শিল্পের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের নির্মিত একাধিক অট্টালিকা ও মসজিদ তাঁদের সু-উন্নত স্থাপত্যরুচির পরিচয় বহন করে।"* জৌনপুরের স্বাধীন সুলতানদের আমলে নির্মিত কয়েকটি স্থাপত্য-নিদর্শন হল *'অটলা মসজিদ', 'জামি মসজিদ', 'দল-দরওয়াজা মসজিদ'* প্রভৃতি। লক্ষণীয় যে, জৌনপুরের মসজিদে কোন মিনার ছিল না এবং গম্বুজগুলিও বেশ নিচু। *জন মার্শাল, ফার্গুসন* প্রমুখ জৌনপুর-রীতির প্রশংসা করেছেন। **ফার্গুসন** লিখেছেন : *"The Jaunpur style is distinguished by its use of pylon or gateway of almost Egyptian mas and outline."* কিন্তু **ড. সরস্বতী** (S. K. Saraswati) মনে করেন যে, *"নতুন উদ্যম ও আশা বাদ নিয়ে জৌনপুর রীতির সূচনা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের চূড়ায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়।"*

মুসলমানদের অনুপ্রবেশের আগে থেকেই গুজরাট তার শিল্প-ভাবনার জন্য খ্যাত ছিল। জাফর খাঁ 'মুজফ্‌ফর শাহ' উপাধি নিয়ে গুজরাটে স্বাধীন সুলতানির সূচনা করলে (১৪০১ খ্রীঃ) সেখানে ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পধারার দ্রুত বিকাশ ঘটে। স্থানীয় হিন্দু স্থপতি ও কারিগরদের সহায়তায় মুজফ্‌ফর শাহের বংশধরেরা গুজরাটে যে স্থাপত্যচর্চা করেন, তাকে অনেকেই 'অনবদ্য ও অতুলনীয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুলতান আহম্মদ্ শাহ নিজনামে 'আহমেদাবাদ' শহরের পত্তন করেন এবং বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ-মসজিদ, তোরণদ্বার ইত্যাদি নির্মাণ করে রাজধানী শহরটিকে সুসজ্জিত করেন। আটটি করে স্তম্ভের উপর স্থাপিত পনেরটি গম্বুজ-বিশিষ্ট 'জামি মসজিদ' আহমেদাবাদের অন্যতম আকর্ষণ। **পার্সী ব্রাউন** লিখেছেন : *"With this mosque the medieval architecture reached a high water-mark of the mosque design in western India."* সৌন্দর্য, রুচিবোধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অলংকরণের বিচারে রানী সিপরী'র সৌধটি অতুলনীয়। এর স্থাপত্যকর্মের প্রশংসা করে **জন মার্শাল** লিখেছেন : *"East or west, it would be difficult to single out a building in which the parts are harmoniously blended or in which balance, symmetry and decorative rhythm combine to produce a more perfect effect."* ফার্গুসন এটিকে আহমেদাবাদের "the most exquisite gem" বলে অভিহিত করেছেন। আহমেদাবাদের আর একটি অনবদ্য স্থাপত্য-নিদর্শন হল সু-অলংকৃত খিলানবিশিষ্ট 'তিনদরওয়াজা' প্রবেশদ্বার।

মালবের স্থাপত্যে দিল্লীর শিল্পধারার প্রাধান্য থাকলেও, এগুলিকে সম্পূর্ণ অনুসরণ বলা যাবে না। মালবের সুলতানেরা প্রথমদিকের স্থাপত্য সৌন্দর্য ও দৃঢ়তার দিকে নজর দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থাপত্যে তাঁরা সৌন্দর্যের সাথে সাথে ব্যবহারিক বিলাসব্যসনের উপর জোর দেন। প্রথম ধারাটি মূলত লক্ষ্য করা যায় ঘুসাং শাহের আমলে এবং দ্বিতীয় ধারাটির বিকাশ ঘটে প্রধানত বাজবাহাদুরের আমলে।

মালবের স্থাপত্যের বিশাল আকার, নিপুণ পাথরের কাজ এবং বিচিত্র গঠনশৈলী ও অলংকরণের প্রশংসা করেছেন জন মার্শাল। মাণ্ডু, ধর ও চান্দেরীতে মালব-স্থাপত্যের অধিকাংশ নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। মাণ্ডুর জামি মসজিদ, হিন্দোলামহল, জাহাজমহল, বাজবাহাদুর ও রানী

রূপমতীর প্রাসাদ, মালবস্থাপত্যের অন্যতম সাক্ষী। এছাড়া লাট মসজিদ, কামাল মৌলার মসজিদ, দিলওয়ার খাঁর মসজিদ, কুশকমহল, বাদলমহল প্রভৃতি মালবের স্থাপত্যকর্মের প্রখ্যাত নিদর্শন হিসেবে রসিকজনের প্রশংসা অর্জন করে। মাণ্ডুর প্রথম পর্বের স্থাপত্যকর্ম সম্পর্কে *জন মার্শাল* লিখেছেন : *"এগুলি ছিল জীবন্ত এবং উদ্দেশ্যমূলক ; কল্পনা ও বাস্তবের অপূর্ব সমন্বয়।"* 'হিন্দোলামহল' দেখতে ঠিক ইংরাজী অক্ষর T-এর মত। এই মহলের প্রশংসা করে ***Percy Brown*** লিখেছেন : *"Few buildings in India present a more striking appearance, or are more solidly constructed than this amazing palace."*

দক্ষিণ-ভারতে স্বাধীন বাহমনী রাজ্যের সুলতানদের নেতৃত্বে এক মিশ্র স্থাপত্যকলার বিকাশ ঘটেছিল। ভারতীয়, তুর্কী, মিশরীয় ও পারসিক শিল্পধারার সমন্বয়ে গঠিত এই স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন গুলবর্গা, বিদর ও বিজাপুরের লক্ষ্য করা যায়। প্রথম তিনজন বাহমনী সুলতানের সমাধিসৌধে তুঘলকী শিল্পধারার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাহমন শাহের সৌধে কিছুটা পার্থক্য ছিল। সবগুলি সৌধই ছিল পাতলা দেওয়াল, ঢালু ছাদ এবং সম্মুখভাগ সাদামাটা, তবে বাহমন শাহ'র সৌধের অলংকরণ ছিল কিছুটা প্রকট। কালক্রমে বাহমনী স্থাপত্যে পারসিক প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং উত্তর-ভারতের ইন্দো-মুসলিম শিল্পধারার পরিবর্তে সেখানে কিছুটা স্বতন্ত্র শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, যা *'দক্ষিণী-রীতি'* নামে পরিচিত হয়। গুলবর্গার জামি মসজিদ থেকে এই নতুন ধারার বিকাশ শুরু হয়। উত্তর-ভারতের মসজিদগুলির মত এই মসজিদের সম্মুখভাগে কোন উন্মুক্ত প্রান্তর ছিল না ;—সম্পূর্ণ অংশটাই ছিল ঘেরা। বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে বাহমনী শিল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। বিশাল বিদরদুর্গ এবং মসজিদ ও প্রাসাদসমূহে পারসিক ও হিন্দু স্থাপত্য-শৈলীর সমন্বয় ঘটে। মামুদ গাওয়ান-এর 'মাদ্রাসা' এবং ষোলাথাম্বা (sixteen pillars) মসজিদ বিদরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়। বাহমনীরাজ্য ভেঙ্গে তার ধ্বংসস্তূপের উপর পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে উঠলে দক্ষিণী শিল্পরীতির তৃতীয়—তথা চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়। এই রাজ্য পঞ্চকের স্থাপত্যকর্মে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগত বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। জাঞ্জিরী মসজিদ, আণ্ডু মসজিদ, হাউজ কাটোরা, চারমিনার প্রভৃতি দক্ষিণী শিল্পরীতির কয়েকটি বিখ্যাত নিদর্শন।

❑ মুঘল চিত্রকলা (Mughal Paintings) :

পারসিক চিত্রধারা অনুসারে মুঘল-ভারতীয় চিত্রধারার বিকাশে স্মরণীয় দুটি নাম হল *বায়াজিদ* এবং তাঁর শিষ্য *আগামারিক*। পারস্যের সাফাভি-বংশীয় সুলতান শাহ ইসমাইলের পৃষ্ঠপোষকতায় বায়াজিদ মোঙ্গলীয় চিত্রকলাকে পরিবর্তিত করে পারসিক চিত্রধারার সৃষ্টি করেন। *'প্রাচ্যের রাফায়েল'* নামে বন্দিত বায়াজিদই প্রথম প্রকৃত অর্থে প্রতিকৃতি অঙ্কনের রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জনৈক প্রখ্যাত চিত্র-সমালোচকের মতে, *'চীন ও জাপানের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হল তার রেখাঙ্কন, পারসিক চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল তার রেখা ও রঙ এবং ভারতের বৈশিষ্ট্য হল রঙের সুষম প্রয়োগ।' এড্ওয়ার্ডস* ও *গ্যারেটের* মতে, মুঘল যুগের চিত্রকলায় এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব অঙ্গীভূতকরণ এবং সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়েছে। এই সমন্বয়ের ফলে মুসলিম চিত্রকলার যেমন রূপান্তর ঘটেছে, তেমনি হিন্দু-চিত্রশিল্পেও নতুনত্ব এসেছে। *'তারিখ-ই-খান্দান-ই-তৈমুর'* এবং *'বাদশাহ নামা'* গ্রন্থে এই ক্রম-পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। *আচার্য যদুনাথ সরকার* লিখেছেন, প্রথম গ্রন্থের ক্ষেত্রে চৈনিক রেখাঙ্কন-পদ্ধতি কিছুটা নমনীয় রূপে গৃহীত হয়েছে এবং দৃশ্যাবলীতে ভারতীয় প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। এবং দ্বিতীয়টিতে চৈনিক প্রভাব সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত এবং ভারতীয় ধারার প্রাধান্য স্পষ্ট।

বাবর

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন আন্তরিকভাবে নিসর্গপ্রেমিক। প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য, তার রূপ পরিবর্তন প্রভৃতি তিনি অবলোকন করতেন একাত্মমনে। আশ্চর্যজনক বিষয় হল এমন আন্তরিকভাবে প্রকৃতিপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও বাবর কোন চিত্র অঙ্কন করেন নি। কিন্তু *বিনিয়ন* (L. Binyon) মনে করেন, বাবর চিত্রশিল্পকে উন্নত করার জন্য কোন উদ্যোগ না নিলেও তাঁর দরবারে চিত্রশিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। আগেই বলা হয়েছে যে, মুঘল চিত্রশৈলীর রস সংগৃহীত হয়েছে পারস্য থেকে। হুমায়ুনের ভাগ্যবিপর্যয় এবং পারস্যে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা বস্তুত মুঘল-চিত্রকলার সূচনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কাকতালীয় ভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য পারস্যের শাহ তহমাস্প-এর চিত্রকলার প্রতি অনীহা এবং একই সময়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে হুমায়ুনের পারস্যে অবস্থান, ভারতবর্ষে পারসিক চিত্রশিল্পীদের আগমনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। পারস্যের দুই দিকপাল চিত্রশিল্পী মীর সৈয়দ আলি এবং আব্দুস সামাদের সাথে তিনি পরিচিত হন এবং কাবুলে তাঁর অস্থায়ী রাজধানীতে তাঁদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাঁরা হুমায়ুনের সঙ্গে দিল্লীতে আসেন এবং চিত্রসৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হুমায়ুন এবং আকবর এই দুই শিল্পীর কাছে নিয়মিত ভাবে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি অনুশীলন করতেন বলে কথিত আছে। কাবুলে অবস্থানকালে আব্দুস সামাদের অঙ্কিত কিছু চিত্র জাহাঙ্গীর সম্পাদিত 'গুলশান এ্যালবামে' সংগৃহীত আছে। সামাদকে বলা হত 'শিরীনকলম' অর্থাৎ তাঁর লেখনী থেকে যেন মধু ঝরত। দিল্লীর সিংহাসন পুনর্দখল করার পর হুমায়ুন পুত্র আকবরের চিত্রাঙ্কনশিক্ষা এবং চিত্রকলার চর্চার জন্য এই দুই প্রথিতযশা শিল্পীর নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গড়ে দেন। এঁদের অধীনে আরো বহু দেশী-বিদেশী শিল্পীর সমন্বয়ে চিত্রকলা চর্চার কাজ এগোতে থাকে।

হুমায়ুন

মুঘল যুগে চিত্রকলাচর্চার প্রাথমিক পর্বে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হল *'দস্তান-ই-আমীর হামজা'* শীর্ষক চিত্রাবলী। এটি সাধারণভাবে *'হামজানামা'* নামে বেশি পরিচিত। প্রায় ১২০০ চিত্রসম্বলিত এই এ্যালবামের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আমীর হামজার জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাভিত্তিক আধাপৌরাণিক ও কল্প-কাহিনীমূলক এই চিত্রগুলি আকবরের খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপির কোথাও চিত্রকরের নাম, পরিচয় বা তারিখ উল্লেখিত না থাকার ফলে এই চিত্রগুলি পণ্ডিতমহলে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। *বদাউনি* এবং *শাহনওয়াজ খান*-এর মতে, সম্রাট আকবরের উদ্যোগে বায়াজিদের সমতুল্য প্রায় পঞ্চাশ জন শিল্পীর পনের বছরের শ্রমের ফল এই অমর চিত্রগুচ্ছ। পক্ষান্তরে, মোল্লা আলাউদ্দিন কাজভিনি 'হামজানামা' শীর্ষক চিত্রগুচ্ছকে হুমায়ুনের মানসপুত্র বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, হুমায়ুনের অস্থির রাজনৈতিক জীবন এবং স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে এই ধরনের বিশাল অঙ্কনপর্ব সমাধা করা সম্ভব ছিল না।

হামজানামা

স্থাপত্যের মতই মমতা ও একাগ্রতা দিয়ে মহান সম্রাট আকবর চিত্রকলাকে লালনপালন করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা এবং ভারতবোধ ভারতীয় চিত্রকলাকে পারসিক বা চৈনিক প্রভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করলেও তাকে বিশিষ্ট ভারতীয় চরিত্র দিতে সক্ষম হয়। *এস. এম. জাফর* লিখেছেন : *"আকবর ভারতীয় চিত্রকলাকে পরানুকরণ-এর কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে একে একটি নিরাপদ ও দৃঢ় ভিত্তি দেন (put on a safe and strong footing by removing the stigma of sacrilege attached is it.)।"* বস্তুত আকবরই মুঘল চিত্রকলাকে যে নির্দিষ্ট আবেগ ও প্রেরণা দেন, তাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের 'মুঘল চিত্ররীতি'র জন্ম হয়। সমকালীন মুসলিম বিশ্বের দুই দিক্‌পাল চিত্রকর খাজা আব্দুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলি সহ বহু চিত্রশিল্পী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অমর শিল্পসৃষ্টি দ্বারা মুঘল চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। *বিনয়ন (L. Binyon)*-এর মতে, প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টিকর্তার উদ্ভাবনী-শক্তির প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন আস্থা। তাই ব্যক্তিগত গৌরববৃদ্ধি বা কৃতিত্বপ্রদর্শন নয়, প্রকৃতির সহজাত সৌন্দর্যের প্রকাশ এবং সৃষ্টিকর্তার গৌরব বৃদ্ধির জন্যই আকবর চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ দেখান। ইসলামের নিয়মানুযায়ী মানুষের প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ বিবেচিত হত। সম্রাট আকবর এই নিষেধাজ্ঞার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রচারের উপর জোর দেন। এই প্রসঙ্গে এক সমাবেশে প্রদত্ত সম্রাটের একটি বক্তব্য আবুল ফজলের বিবরণীতে পাওয়া যায়। আকবর যেখানে বলছেন : *"অনেকে চিত্রকলাকে ঘৃণা করে, আমি তাদের অপছন্দ করি। আমার মতে চিত্রকরের পক্ষে ঈশ্বরকে জানার একটা স্বকীয় উপায় আছে। কারণ চিত্রকর যখন এমন কিছু আঁকতে চায় যার প্রাণ আছে, যখন সে একের পর এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অঙ্কন করে, তখন সে উপলব্ধি করে যে তার পক্ষে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব নয়। তখন সে জীবনদাতা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে, তার জ্ঞান বর্ধিত হয়।"* চিত্রাঙ্কনের সমর্থনে নিজ যুক্তিপ্রদর্শনের পর তিনি সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার চর্চা শুরু করেন। *'আইন-ই-আকবরী'* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, *"আকবর চিত্রাঙ্কনকে একাধারে শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের মাধ্যম বলে বিবেচনা করতেন এবং চিত্রকলার চর্চায় সমস্ত ধরনের সাহায্য ও উৎসাহ সম্প্রসারণ করতে দ্বিধা করতেন না।"* আকবর নিজে ছবির গুণাগুণ বিচার করতেন এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারও প্রদান করতেন।

আকবর

আকবরের আমলের চিত্রকরদের মধ্যে হিন্দু চিত্রকরের প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। সামাদ ও মীর আলি ছাড়া বহিরাগত খ্যাতিমান চিত্রকর হিসেবে *ফারুক বেগ, খসরু কুলি* প্রমুখের নাম

স্মরণীয়। হিন্দু চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন *দশবন্ত, বসাওন, কেশব, মুকুন্দ, মিস্কিন, ফারুক কালমাক, মধু, জগন, মহেশ, খেমকরণ, তারা, হবিবন্স, লাল, সনওয়ালা* প্রমুখ। আবুল ফজল তৎকালীন যে সতের জন অগ্রণী চিত্রকরের নামোল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্তত তের জন ছিলেন হিন্দু। মুঘল চিত্রকলার বিকাশে এঁদের অবদান ছিল বিশাল। **আবুল ফজল** এঁদের প্রশংসা করে লিখেছেন : *"their pictures surpass our conception of things. Few, indeed, in the whole world are found equal to them."* দশবন্ত ছিলেন জাতিতে কাহার (পালকিবাহক)। কিন্তু তাঁর অঙ্কন-প্রতিভা আকবরকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, দশবন্তের প্রতিভা বায়াজিদ কিংবা চৈনিক চিত্রকরদের তুলনায় কিছু কম ছিল না। 'রজম্‌নামা' গ্রন্থের অলংকরণে দশবন্তের প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অবশ্য এই অলংকরণের মাঝপথে দশবন্তের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং তিনি আত্মহত্যা করেন (১৫৪৮ খ্রীঃ)। প্রায় ২৯টি ছবির বহিরঙ্গ তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেন মহম্মদ শরিফ। এছাড়া, লাল, বসাওন, তুলসী প্রমুখ বহু শিল্পী এই অলংকরণের কাজে হাত লাগান। চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন দিকে বসওয়ানের দক্ষতা ছিল। কলিকাতা জাদুঘরে রক্ষিত 'মজনু' চিত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'রজম্‌নামা' ছাড়া আকবরের আমলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রালংকৃত পুস্তক হল *রামায়ণ* (১৫৮৮ খ্রীঃ), *দিওয়ান* (১৫৮৮ খ্রীঃ), *তারিখ-ই-কান্দাহারি, আকবর-নামা, বহারিস্তান* (১৫৯৪-৯৫ খ্রীঃ), *বাবর-নামা* (১৫৯৫-'৯৬ খ্রীঃ), *জামিউৎ-তারিখ* (১৫৯৬ খ্রীঃ), আমীর খসরুর, *'খামসা'* হাফিজের *'দিওয়ান'; 'তারিখ-ই-আলফি'* (১৫৯৭ খ্রীঃ) ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থের চিত্রঅলংকরণ, গঠনগত ঐক্য এবং স্থান ও রং-এর আনুপাতিক প্রয়োগ-এর বিচারে শিল্পীদের চূড়ান্ত দক্ষতার প্রমাণ তুলে ধরে। এই সকল ছোট ছোট চিত্রকল্পে পারসিক, তুর্কী, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় শিল্পাদর্শের অপূর্ব সমন্বয়ের ছবি পাওয়া যায়।

আকবরের চিত্রকর্ম

চিত্রকলাচর্চার ক্ষেত্রে আকবর যে ধারার সূচনা করেছিলেন, জাহাঙ্গীর তাকে রঙে-রূপে সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করার কাজে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখান। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন চিত্রকলার সমঝদার অনুরাগী। নিজ আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন : *"একাধিক চিত্রকরের আঁকা একই ধরনের বহু ছবি সামনে রাখলে আমি নিমেষে বলতে পারি কোন্‌টির চিত্রকর কে। এমনকি একাধিক শিল্পী দ্বারা একটিমাত্র ছবি অঙ্কন করলে আমি বলতে পারি ছবির কোন্ অংশটি কোন্ চিত্রকর এঁকেছেন।"* এই বক্তব্যে হয়ত অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু চিত্রকলার প্রতি যে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল, তা প্রমাণ করার পক্ষে এই স্বীকারোক্তি যথেষ্ট। ইংরেজ পর্যটক *স্যার টমাস রো* লিখেছেন যে, জাহাঙ্গীর ছিলেন উন্নতমনা চিত্র-সংগ্রাহক। বহু বিদেশী চিত্র তাঁর সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছিল। তিনি বহু প্রখ্যাত চিত্রকে অবিকল নকল করিয়েও নিজসংগ্রহে রেখেছিলেন। *পার্সী ব্রাউন*-এর ভাষায় তিনি ছিলেন *'the type of rich collector perennial through the ages.'* চিত্রকলার প্রতি জাহাঙ্গীরের অনুরাগ ছিল সহজাত ও অকৃত্রিম। আকবরের রাজত্বের শেষপর্বে সম্রাটের উদ্যোগের বাইরে শাহজাদা সেলিমও (জাহাঙ্গীরের পূর্বনাম) চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে কিছু সফল উদ্যোগ নেন। হিরাটী চিত্রকর আকারিজার তত্ত্বাবধানে সেলিম একটি চিত্রশালা গঠন করেন এবং অনন্ত, আবুল হাসান, বিষণ দাস প্রমুখ সহ-চিত্রকরের সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ-অলংকরণের কাজ সম্পন্ন করেন। এগুলির মধ্যে *'রাজকুমার'* এবং নিজামউদ্দিন দলভি'র *'গজল ও রুবাইৎ'* সংকলনগ্রন্থ (১৬০২ খ্রীঃ) দুটির চিত্র-অলংকরণ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। *'দিওয়ান'* (হাফিজকৃত) *'আনোয়ার-ই-সুহেলি'* গ্রন্থের অলংকরণের কাজও এইসব শিল্পী সম্পন্ন করেন। এই পর্বে সেলিম ও তাঁর

জাহাঙ্গীর

চিত্রকরদের অংকিত চিত্রাবলীর সাথে আকবরের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগত একটি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। আকবরের ছবিগুলি ছিল পরিশুদ্ধ ও আভিজাত্যে পূর্ণ; কিন্তু সেলিমের ছবিগুলির মধ্যে ছিল সারল্য ও গ্রামীণ সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ।

জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রকলায় পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গচিত্রের পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তি, সন্ত, গায়ক ও সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন চিত্রকরদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রকাশ বর্মা তাঁর *'ইন্ট্রোডাকশন অফ সেফ পোর্ট্রেট পেইন্টি ইন ইণ্ডিয়া'* গ্রন্থে লিখেছেন, মুঘল আমলের প্রতিকৃতি অঙ্কন পারসিক ও প্রাক্-মুঘল ভারতীয় কলা দ্বারা প্রভাবিত। প্রাথমিক মুঘল-রীতির 'তিন-চতুর্থাংশ মুখচিত্রন জাহাঙ্গীরের আমলে প্রায় লোপ পেয়ে যায় এবং তার স্থান দখল করে অর্ধ-মুখচিত্রন'। একে তিনি মুঘল চিত্রকলার ভারতীয়করণ বলে অভিহিত করেছেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে দক্ষ প্রতিকৃতি-চিত্রবিদ্ হিসেবে ***বিষণদাস*** ও ***আবুল হাসানের*** নাম উল্লেখ করেছেন। ***সোমপ্রকাশ বর্মার*** মতে, বিচিত্র প্রায় সমদক্ষতাসম্পন্ন চিত্রকর ছিলেন। প্রতিকৃতি-অঙ্কনে মনের ভাব ফুটিয়ে তোলার দিকে বিচিত্র'র প্রয়াস ছিল প্রশংসনীয়। মুখাবয়বের সজীবতা ও লক্ষণগত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। তাঁর 'গায়ক, বাদক ও অন্য' চিত্রটিতে এই সজীবতা লক্ষ্য করা যায় স্পষ্টভাবে। ***বেসিল গ্রে*** এবং ***ডগলাস ব্যারট*** মুঘল যুগের প্রতিকৃতি-অঙ্কনে আদর্শীকরণ-এর প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক উৎসব বা ঘটনাবলীর সাথে প্রতিকৃতি-অঙ্কনের বহু নিদর্শন জাহাঙ্গীরের আমলে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের অভিষেক, হোলি, দেওয়ালি, তুলাদান প্রভৃতি উৎসবে জনসমাবেশ ও শিকারের দৃশ্য প্রভৃতি বহু সমধর্মীয় চিত্র নানা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। শ্রীবর্মা মুঘল যুগে সাধারণ মানুষের চিত্রাঙ্কন-ব্যবস্থার নৈতিক ও কলাবিষয়ক গুরুত্বের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন : *"সাধারণ মানুষের যথাযথ চিত্রণ ভারতীয় কলায় মুঘল চিত্রকরদের বিশেষ অবদান।"* বিচিত্র-র উপরিলিখিত চিত্রটি 'সাধারণ মানুষের কাজকর্মের সজীব চিত্রণের' একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ মানুষের এত বিশদ চিত্রণ মুঘলপূর্ব কিংবা মুঘল আমলের ভারতীয় কলায় আর দেখা যায়নি। জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির আর একটি অভিনবত্ব হল পাড়-চিত্রণ। মূল ছবির সঙ্গে মিল রেখে পাড়-চিত্রণের রেওয়াজ আকবরের আমলেও ছিল। ***শ্রীবর্মার*** মতে, *'দেওয়ান-ই-হাফিজ'* (১৫৮৫ খ্রীঃ) পাণ্ডুলিপির অলংকৃত পাড়টি পাড়-চিত্রণের প্রথম দৃষ্টান্ত। পরবর্তী কালে *'বাবরনামা'*, *'খামসা'* ইত্যাদি পাণ্ডুলিপিতে পাড়-চিত্রণের ক্রমবিকাশ ঘটে। জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রকলার এক স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে পাড়-চিত্রণ বিকাশলাভ করে এই পদ্ধতিকে অভিনবত্ব দেয়। শাহজাহানের আমলে এটি প্রভূত বিকাশলাভ করে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ছবির মূল রূপকার এবং পাড়-চিত্রণের শিল্পী ছিলেন পৃথক ব্যক্তি।

চিত্রকর্ম

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল-চিত্রকলার গৌরব-রশ্মিও অস্তমিত হয়। ***পার্সী ব্রাউন***-এর ভাষ্যে : *"the real spirit of Mughal painting departed with the death of Jahangir."* শাহজাহান চিত্রকলার তুলনায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি ছিলেন বেশি আগ্রহী। শাসনকালের সূচনাপর্বেও চিত্রকলার প্রতি তাঁর যেটুকু অনুরাগ ছিল, পরবর্তী কালে তাও ফিকে হয়ে যায়। দরবারী চিত্রশিল্পীর সংখ্যা তিনি ভীষণভাবে কমিয়ে দেন। ফলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য শিল্পীদের মধ্যে অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অন্যদিকে বহু শিল্পী ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রাঙ্কনের কাজ শুরু করেন। ফলে চিত্রাঙ্কনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একচেটিয়া কৃতিত্ব লোপ পায়। কিন্তু জাহাঙ্গীর পর্যন্ত সময়কালে বাদশাহী আনুকূল্যে চিত্রকলার যে স্বাভাবিক ও বর্ণময় বিকাশ

চিত্রকর্মে শৈথিল্য

ঘটেছিল, আলোচ্যপর্বে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বহু চিত্রকর ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিত্রশালা স্থাপন করে নিছক জীবিকা অর্জনের জন্য চিত্রাঙ্কন-কর্ম চালিয়ে যান। পর্যটক বার্নিয়ে এদেশে এসে এই ধরনের বহু চিত্রকরের সন্ধান পেয়েছিলেন যাঁরা বাণিজ্যিক-চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিজের বীরত্বব্যঞ্জক চিত্রাঙ্কনের প্রতি শাহজাহানের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই সকল চিত্রে বর্ণাঢ্যতার প্রাবল্য ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রাণস্পন্দন ও সৌন্দর্য ছিল না।

শাহজাহানের আমলে মুঘল-চিত্রকলার অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে তা পূর্ণতা পায়। প্রখর বাস্তববাদী এবং গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী ঔরঙ্গজেবের মতে, চিত্রাঙ্কন ছিল বিলাসিতা এবং ইসলামের আদর্শবিরোধী। তিনি নিজহাতে বহু অমর চিত্রসৃষ্টিকে বিনষ্ট করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে, যেমন বিজাপুরের 'আসরমহলে' ছবিগুলি। *মানুচি* লিখেছেন : ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে সিকান্দ্রায় আকবরের স্মৃতিসৌধের চিত্রগুলিকে চুনকাম করে বেচে দেওয়া হয়েছিল। এমনি দৃষ্টান্ত আরও আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের আমলে চিত্রচর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। প্রতিকৃতি অঙ্কনের দিক্‌পাল শিল্পীরা আগের মতই তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি তাঁরা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবনের নানা মুহূর্তকেও ছবিতে প্রস্ফুটিত করেছেন। শিকাররত সম্রাট, পাঠক সম্রাট, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালনারত সম্রাট, এমনি বহুচিত্র তখন অঙ্কিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, সম্রাটের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন না থাকলে একাজ করা সম্ভব হত না। *স্যার যদুনাথ সরকার* লিখেছেন যে, গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী পুত্র মহম্মদ সুলতানের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য ঔরঙ্গজেবের নির্দেশমত প্রতিদিন বন্দী শাহজাদার প্রতিকৃতি এঁকে বাদশাকে দেখানো হত। অবশ্য এসবই ছিল আপাত পরিণতি। চিত্রকলার মর্মে প্রবেশ করে তাকে সঞ্জীবিত করার কণামাত্র ইচ্ছা ঔরঙ্গজেবের ছিল না। তাই *এডওয়ার্ডস্* ও *গ্যারেটের* ভাষায় বলা যায় : *"It (art of painting) had reached its zenith under Jahangir and has commenced to lose its vitality under Shahjahan; its decline was hastened by the attitude of Aurangzeb."* ঔরঙ্গজেবের অনিচ্ছা ও উদাসীনতা মুঘল- দরবারের ঐতিহ্যশালী চিত্রশালার প্রাণবায়ু হরণ করে নেয়। বহু শিল্পী স্থানান্তরে গিয়ে (অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, পাটনা, মহীশূর প্রভৃতি) আঞ্চলিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়, মুঘল চিত্রকলার ঐতিহ্যকে চলমান রাখার উদ্যোগ নেন। তাঁরা সম্পূর্ণ বিফল হয়ত হন নি, কিন্তু দিল্লীর পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার যে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত বিকাশ ঘটেছিল, তা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঔরঙ্গজেব ও চিত্রকর্মে বিনাশ

প্রসঙ্গত আলোচ্য পর্বে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিকশিত চিত্রকর্মের ধারা সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। মুঘলধারা থেকে স্বতন্ত্র হলেও এই পর্বে রাজস্থান ও মধ্য-ভারতের নানা অংশে, যেমন মেবার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দি, মালব ইত্যাদি এবং দক্ষিণ-ভারতের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় ভারতীয় চিত্রচর্চার কাজ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথেই পালন করা হচ্ছিল। রাজস্থানের চিত্রকর্মে মুঘল-চিত্রধারার প্রভাব অবশ্যই ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপবিন্যাস, পশ্চাদপট, অলংকরণ, রঙের ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুঘল-ধারা লক্ষ্য করা অসম্ভব নয়, তথাপি রাজস্থানী চিত্রকলা সামগ্রিক বিচারে তার মৌলিক বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কর্মসূত্রে বহু রাজপুত শাসক মুঘল দরবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। স্বভাবতই দেশের বহমান ঘটনাবলীর সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ থাকত। রাজস্থানী চিত্রকলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সেই সকল

আঞ্চলিক চিত্রচর্চা

এখানে একটা জোরালো প্রভাব ছিল। ধর্মবিশ্বাস এবং আবেগপ্রবণতার সমন্বয়ে রাজস্থানী-চিত্রকলা অনেক ক্ষেত্রেই মুঘল-ধারাকে অতিক্রম করে গেছে। **ঈশ্বরীপ্রসাদ** লিখেছেন : *"With its spiritual and emotional inspirations it supersedes the secular and matter-of-fact Mughal style."*

সংখ্যায় সীমিত হলেও দেশের দক্ষিণ প্রান্তের দুটি মুসলিম রাজ্য বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল। বিজাপুরের দুই বুদ্ধিদীপ্ত শাসক *আলি আদিল শাহ* (প্রথম) এবং *ইব্রাহিম আদিল শাহ* (দ্বিতীয়) শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক। দক্ষিণী চিত্রকলা ছিল খুবই পরিশীলিত, আভিজাতপূর্ণ এবং অলংকৃত। এদের মধ্যে ছিল এক শান্ত সমাহিত কাব্যিক ভাব। অবশ্য পাশাপাশি অবস্থান এবং জটিল রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং আহম্মদনগরের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির মাঝে কোন বিভেদ রেখা টানা সম্ভব নয়। পুনার ইতিহাস-সংশোধন মণ্ডলে রক্ষিত *'তারিফ-ই-হুসেনশাহী'*, পাণ্ডুলিপির অলংকরণ এবং দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত 'রাগ-রাগিণী' ভিত্তিক কিছু চিত্র বিজাপুরের চিত্রকর্মের অনবদ্য নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ্য। চেস্টার বেটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত *'নাজম্-অল-আলম'* চিত্রকর্মগুলিও বিজাপুরের সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়। উভয় চিত্রকর্ম সম্পন্ন হয়েছিল ১৫৬৫ থেকে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। পণ্ডিতদের মতে, অতি আকর্ষণীয় এবং আড়ম্বরপূর্ণ 'নারী' চিত্রটিও বিজাপুরের অন্যতম সৃষ্টি। সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত সময়কালে গোলকুণ্ডা এবং আহম্মদনগরও কিছু অমর চিত্রসৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এদের চিত্রকর্মে শিথিলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

❑ সঙ্গীত (Music) :

ঔরঙ্গজেব ব্যতীত মহান মুঘল শাসকদের প্রায় সকলেই ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী। বাবর ও হুমায়ুন সুকুমার কলার মত সঙ্গীত বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। কথিত আছে, বাবর সঙ্গীত-ধারা সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। হুমায়ুন এবং তাঁর হ্যারেমের রমণীগণ নিয়মিত সঙ্গীত-নৃত্য উপভোগ করতেন বলেই জানা যায়।

আকবরের আমলে সঙ্গীতচর্চাও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। সম্রাট স্বয়ং এই কলার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কেবল সঙ্গীতের শ্রোতা বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, সমালোচক ও স্রষ্টা হিসেবেও তাঁর কিছু অবদান ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন যে, সম্রাট সঙ্গীতের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন এবং এই হৃদয়গ্রাহী শিল্পের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর দরবারে হিন্দু, পারসিক, তুরানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পুরুষ ও রমণী সঙ্গীতবিদ্‌দের অবস্থান ছিল। সভাগায়করা সাতটি দলে বিভক্ত থাকতেন এবং সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এক-একদিন এক-এক গোষ্ঠী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। আবুল ফজলের মতে, সঙ্গীতকলা সম্পর্কে আকবর যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, তা অনেক দক্ষ সঙ্গীতকারের মধ্যেও ছিল না। হিন্দু রাগ-সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি লাল কলাবন্ত-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রায় দুই শতাধিক পারসিক সুরের তিনি সমন্বয় করেন। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুরাগের ছোঁয়া তাঁর সভাসদ্‌দেরও স্পর্শ করে। অভিজাতরাও সঙ্গীতকলার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। দক্ষ শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য ঘোষিত হয় বিশাল অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার। দৃষ্টান্ত হিসেবে আব্দুর রহিম খান-খানান কর্তৃক জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ রামদাসকে এক লক্ষ টাকা এবং সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মিঞা তানসেনকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদানের কথা উল্লেখ করা যায়। মুঘল আমলে সঙ্গীতের সহযোগী বাদ্য হিসেবে

আকবর

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ শিল্প ও সংস্কৃতি (Art and Culture) ঃ

সূচনা

শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মোগল যুগ এক গৌরবময় অধ্যায়। ***ডঃ সতীশ চন্দ্র*** এই যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশকে গুপ্তযুগের সঙ্গে তুলনা করে এই যুগকে *'দ্বিতীয় ধ্রুপদী যুগ'* ('Second classical age') বলে অভিহিত করেছেন।[১] তাঁর মতে, এই সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূলে ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মোগলদের দ্বারা বিদেশ থেকে আনা তুর্কি-পারসিক সংস্কৃতি।

● স্থাপত্য শিল্প (Architecture) ঃ

প্রকৃতি

স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে মোগল যুগ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশিষ্ট শিল্প-বিশেষজ্ঞ ***ফার্গুসন*** (Ferguson)-এর মতে মোগল স্থাপত্যকার্যগুলিতে পারসিক প্রভাব স্পষ্ট। মোগল আমলে নির্মিত স্থাপত্যগুলিতে যে গম্বুজ ও থামের ব্যবহার দেখা যায় তার মধ্যে তিনি পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। অপরপক্ষে, ***অধ্যাপক হ্যাভেল*** (Havell) বলেন যে, ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে বহির্বিশ্বের নানা জাতি ও দেশের ভাবধারাকে সাদরে বরণ করেছে। মোগল যুগে ভারতীয় স্থাপত্যে কিছু পারসিক প্রভাব পড়তেই পারে, কিন্তু মোগল স্থাপত্যের মূল শিকড় ভারতীয় প্রথার মধ্যেই গাঁথা ছিল। ***জন মার্শাল*** (John Marshall) মোগল স্থাপত্যের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। (১) ভারতীয় স্থাপত্যে কোনও একটি বিশেষ রীতি ছিল না—বিশাল ভারতবর্ষের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। (২) সম্রাটদের ব্যক্তিগত রুচির ওপরেও স্থাপত্যকার্য নির্ভরশীল ছিল। ***আধুনিক গবেষকদের*** মতে মোগল স্থাপত্য পারসিক ও ভারতীয় ভাবধারার সংমিশ্রণ।

বাবর

বাবরের আত্মজীবনী *'তুজুক-ই-বাবরী'* থেকে স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা জানা যায়। ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভালো ছিল না। এই কারণে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে আলবানিয়ান স্থপতিদের ভারতে আনতে চেয়েছিলেন—যদিও তাঁর এই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় নি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, প্রাসাদ ও দুর্গাদি নির্মাণের জন্য তিনি আগ্রায় ৬৮০ জন এবং সিক্রি, বায়ানা, ঢোলপুর প্রভৃতি স্থানে ১৪৯১ জন কর্মী নিযুক্ত করেন। মাত্র চার বছর রাজত্ব করলেও তিনি আগ্রা, সিক্রি, বায়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, কিউল প্রভৃতি স্থানে প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রাসাদগুলির মধ্যে পানিপথের *'কাবুলবাগ মসজিদ'* ও সম্বলের *'জামা মসজিদ'* উল্লেখযোগ্য। তাঁর উদ্যোগে বেশ কিছু উদ্যান নির্মিত হয়। এগুলি *'মোগল বাগিচা'* নামে পরিচিত। এগুলির মধ্যে কাশ্মীরের *'নিসাৎবাগ'*, লাহোরের *'শালিমার'* এবং পাঞ্জাবের *'পিঞ্জোরবাগ'* আজও বিস্ময় উৎপাদন করে।

---

[১] "..... the Mughal period can be called a second classical age following the Gupta age in northern India."—*Medieval India*, Part II, Satish Chandra, N. C. E. R. T., P. 200

হুমায়ুন

যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও হুমায়ুন তাঁর রাজত্বের সূচনা-পর্বে বেশ কিছু প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করান। তিনি পারসিক শিল্প ঐতিহ্যের অনুরাগী ছিলেন। পাঞ্জাবের হিসার জেলার ফতেহাবাদ ও আগ্রায় তাঁর নির্মিত মসজিদ দু'টির ধ্বংসাবশেষ আজও টিকে আছে। তিনি দিল্লিতে *'দিন্‌পনাহ্'* নামে একটি নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এ কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি।

শের শাহ

অল্পদিন রাজত্ব করলেও শের শাহ বেশ কিছু সৌধ, উদ্যান, মিনার, সরাইখানা ও শিক্ষায়তন নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্যগুলিতে সুলতানি যুগের ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সঙ্গে মোগল যুগের ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নির্মিত স্থাপত্য-কীর্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দিল্লির *'পুরানা কিল্লা'* এবং বিহারের সাসারামে নির্মিত তাঁর *'সমাধি-সৌধ'*। 'পুরানা কিল্লা' আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তিনি এই দুর্গের অভ্যন্তরে *'কিলা-ই-কোহনা'* নামে একটি অপূর্ব মসজিদ নির্মাণ করেন। এর গঠন-পরিকল্পনা ও অলঙ্করণে মুগ্ধ বিশিষ্ট শিল্প-বিশেষজ্ঞ *পার্সি ব্রাউন* এই মসজিদটিকে 'a gem of architectural design' বলে অভিহিত করেছেন। সাসারামে নির্মিত তাঁর সমাধি-সৌধটিতে হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

আকবর

মোগল স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃত সূচনা হয় আকবরের আমল থেকেই। স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আকবরের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে বহু প্রাসাদ, দুর্গ, সৌধ ও মসজিদ নির্মিত হয়। তাঁর আমলের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যই ছিল ভারতীয় ও পারসিক শিল্পরীতির মিশ্রণে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ। (১) তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের প্রথম নিদর্শন হল *হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ*। হুমায়ুনের মৃত্যুর আট বছর পর ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং তা সমাপ্ত হয় ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে। এই সমাধি-সৌধটি সম্পূর্ণভাবে মর্মর-প্রস্তরে তৈরি এবং এতে পারসিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সুষ্ঠু সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। (২) তিনি আগ্রা, লাহোর, এলাহাবাদ, আটক প্রভৃতি স্থানে *দুর্গ* নির্মাণ করেন। এগুলির মধ্যে *আগ্রা দুর্গ* সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। লাল পাথরে নির্মিত এই দুর্গের গঠনে রাজপুত দুর্গ নির্মাণ-রীতির স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দুর্গের অভ্যন্তরস্থ দিল্লি গেট, জাহাঙ্গীর মহল ও আকবরী মহল স্থাপত্য কীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। (৩) আকবরের স্থাপত্য-কীর্তির সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে *ফতেপুর সিক্রি*-র সৌধরাজিতে। লালবর্ণের মর্মর-প্রস্তরে নির্মিত ফতেপুর সিক্রি-র স্থাপত্যে হিন্দু ও ইসলামিয় স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। ফতেপুর সিক্রির 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস্', 'পঞ্চমহল', 'খাসমহল', 'জামি মসজিদ', 'বীরবলের প্রাসাদ', 'যোধবাঈ-এর প্রাসাদ', 'সেলিম চিস্তির সমাধি', 'বুলন্দ দরওয়াজা' প্রভৃতির শিল্প-নৈপুণ্য আজও সকলকে বিস্মৃত করে। *স্মিথ*-এর দৃষ্টিতে ফতেপুর সিক্রি হল 'পাথরে তৈরি কল্পনা ও স্বপ্ন' ('a romance in stone')। *ফার্গুসন*-এর মতে ফতেপুর সিক্রি হল 'মহৎ-প্রাণের প্রতিবিম্ব'। *লেনপুল* বলেন যে, "ভারতবর্ষের কোথাও এমন স্থান নেই, যা এই পরিত্যক্ত

শহরের চেয়ে সুন্দর, অথচ যা এর চেয়ে বেশি বেদনা মনে জাগিয়ে তোলে।" (৪) সেকেন্দ্রায় নির্মিত আকবরের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পক তিনি নিজেই। এই বিখ্যাত সৌধ নির্মাণে অনেকে বৌদ্ধ বিহারের প্রভাব লক্ষ্য করেন। *ফার্গুসন* মহাবলীপুরমের রথমন্দিরগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

স্থাপত্য শিল্পের প্রতি জাহাঙ্গীরের কোনও আগ্রহ ছিল না। এ কারণে তিনি সেকেন্দ্রায় তাঁর পিতার *স্মৃতি-সৌধের* নির্মাণকার্য শেষ করেন নি। নূরজাহানের আগ্রহেই এর নির্মাণকার্য শেষ হয়। এ সত্ত্বেও তাঁর আমলে আর যে সব সৌধ নির্মিত হয় সেগুলি হল লাহোরে *জাহাঙ্গীরের সমাধি*, দিল্লিতে *আবদুর রহিম খান খানানের সমাধি* ও আগ্রায় নূরজাহানের পিতা *ইতিমাদ-উদ্-দৌলার সমাধি-ভবন*। তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রক্তাভ বেলে পাথরের পরিবর্তে শ্বেতবর্ণ পাথরের ব্যবহার। এছাড়া তিনিই প্রথম মোজাইকের ব্যবহার চালু করেন। আকবর ভারতীয় ও পারসিক শিল্পরীতির সমন্বয়ের ওপর জোর দিতেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলের স্থাপত্যে অধিকতর পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আগ্রার যমুনা তটে ইতিমাদ-উদ্-দৌলার সমাধি-ভবনটি সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরে তৈরি। *পার্সি ব্রাউন* এই স্মৃতি-সৌধটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

জাহাঙ্গীর

সম্রাট শাহজাহানের আমলে মোগল স্থাপত্য শিল্প গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। তাঁর রাজত্বকালকে নিঃসন্দেহে মোগল স্থাপত্যের সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করা যায়। তিনি কাবুল, কাশ্মীর, দিল্লি, আগ্রা, লাহোর এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে বেশ কিছু প্রাসাদ ও স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করেন। মৌলিকতার দিক থেকে এগুলি আকবরের আমলের শিল্প-কৌশল অপেক্ষা নিম্নস্তরের হলেও সৌষ্ঠব ও অলঙ্করণের দিক থেকে এগুলি অতি উচ্চমানের। তাঁর আমলে ভারতীয়-পারসিক স্থাপত্য শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে। (১) আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে শ্বেতবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত *'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস্', 'শিস মহল'* ও *'মোতি মসজিদ'*-এর শিল্প-নৈপুণ্য অসাধারণ। 'মোতি মসজিদ' হল মোগল স্থাপত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। শিল্প-বিশেষজ্ঞ *ফার্গুসন*-এর মতে মোতি মসজিদ হল "one of the purest and most elegant buildings of its class to be found elsewhere."। (২) তিনি দিল্লি-তে *'শাহজাহানাবাদ'* নামে একটি রাজধানী-নগরী প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। *ফার্গুসন*-এর মতে, কেবলমাত্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেই নয়— এই নগরীটি সমগ্র বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুরম্য, অলংকৃত ও বিস্ময়োদ্দীপক এক সৃষ্টি। এই নগরীতেই আছে বিখ্যাত *'লালকেল্লা'*। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী দুই শতক ধরে এই 'লালকেল্লা'-ই ছিল মোগল শাসনের কেন্দ্রস্থল। এই দুর্গের অভ্যন্তরে সম্রাটের *বাসস্থান, হারেম, 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস্'* নির্মিত হয়। 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস্'-এর শিল্পনৈপুণ্য ও অলংকরণ আজও দর্শকদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। 'দেওয়ান-ই-আম'-এর থাম ও গম্বুজের গঠন-প্রণালী এমনই ছিল যে এই বিশাল কক্ষের যে কোনও স্থান থেকে সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাকে ভালোভাবে দেখা যেত এবং তাঁর বক্তব্য সর্বত্র

শাহজাহান

একইভাবে শোনা যেত। এই সভাকক্ষের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত ছিল শিল্পী রেবাদল খাঁ নির্মিত এবং বহু মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত *'ময়ূর সিংহাসন'*। রত্নখচিত ময়ূর বাহন হিসেবে সিংহাসনটিকে পিঠে ধরে রাখত এবং সিংহাসনের মাথায় ছিল মূল্যবান হীরা ও রত্নখচিত ছাতা। পারস্য সম্রাট নাদির শাহ দিল্লি লুঠ করে এই সিংহাসনটি নিয়ে যান। লালকেল্লার অদূরে শাহজাহান নির্মাণ করেন ভারতের সর্ববৃহৎ মসজিদ—*'জামি মসজিদ'*। (৩) শাহজাহানের অসাধারণ কীর্তি হল আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে শ্বেতমর্মর প্রস্তরে নির্মিত অনবদ্য স্মৃতিসৌধ—*'তাজমহল'*। পত্নী মমতাজমহলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত অপূর্ব কারুকার্য-শোভিত এই স্মৃতিসৌধটি বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়। শিল্প-বিশেষজ্ঞ *ফার্গুসন*-এর মতে, এই সৌধটি হল বহু সৌন্দর্যের সমন্বয়। একটি সৌন্দর্য অপরটির সঙ্গে নিপুণভাবে যুক্ত হয়ে সমগ্র সৌধটিকে মহিমাময় করে তুলেছে, যার তুলনা পৃথিবীতে নেই। শিল্প সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিও এর দ্বারা চমকিত হবেন। মমতাজমহলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং তা শেষ করতে সময় লাগে মোট বাইশ বৎসর। এর জন্য ব্যয় হল প্রায় তিন কোটি টাকা। সমকালীন ঐতিহাসিক *আবদুল হামিদ লাহোরি* অবশ্য এ প্রসঙ্গে বারো বছর সময় এবং ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা বলেন। তাজমহলের পরিকল্পক কে তা নিয়েও মতপার্থক্য আছে। স্পেনীয় পর্যটক *ফাদার মানরিখ* (Father Manrique)-এর মতে, তাজের গঠন-পরিকল্পনা করেন জারোনিমো ভারোনিও (Geronimo Verronio) নামে জনৈক ভেনেসিয় স্থপতি। এই মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সমকালীন কোনও ভারতীয় লেখক বা ইওরোপীয় পর্যটক তাজের স্থপতি হিসেবে এই ভেনেসিয় স্থপতির কথা উল্লেখ করেন নি। সমকালীন রচনা *'দেওয়ান-ই-আফ্রিদি'* নামক গ্রন্থে তাজের স্থপতি ও কারিগরদের নাম, ধাম ও বেতনের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে। সেখানে কিন্তু কোনও ইওরোপীয় স্থপতির নামোল্লেখ নেই। শিল্প-বিশেষজ্ঞ *হ্যাভেল*-ও কোনও ভেনেসিয় স্থপতিকে তাজের পরিকল্পকের মর্যাদা দিতে রাজি নন। *ডঃ স্মিথ* তাজমহলকে ইওরোপীয় ও ভারতীয় প্রতিভার যৌথ সাফল্য বলে বর্ণনা করেছেন। এ বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ শিল্প-বিশেষজ্ঞরা তাজের নির্মাণশৈলী, অভ্যন্তরীণ গঠন ও অলংকরণে সম্পূর্ণ প্রাচ্য ভাব লক্ষ্য করেছেন—পাশ্চাত্য স্থাপত্য-রীতির কোনও ছাপই খুঁজে পান নি। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে *থেভেনট* নামক জনৈক ফরাসি তাজমহল পরিদর্শনের পর মন্তব্য করেন যে, "এটি ভারতীয়দের সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।" *আবদুল হামিদ লাহোরি* বলেন যে, তাজের স্থপতিদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়। *দেওয়ান-ই-আফ্রিদি* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তাজের অভ্যন্তরীণ অলংকরণ করেন মুলতান ও কনৌজের হিন্দু শিল্পীরা, বাগানের নক্সা করেন কাশ্মীরের হিন্দু বাগান-বিশারদ রণমল, তাজের গাত্রে কোরানের বাণীগুলি খোদাই করেন কান্দাহারের শিল্পী আমানত খাঁ শিরাজি, গম্বুজের কাজে প্রধান ছিলেন কন্‌স্ট্যান্টিনোপল থেকে আগত ইসমাইল খাঁ রুমী। তাজমহলের মূল পরিকল্পক ছিলেন আগ্রার অধিবাসী ওস্তাদ ঈশা।

তাজমহল

ধর্মান্ধতার কারণে ঔরঙ্গজেব শিল্পকলার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তিনি লাহোরে *পাদশাহি মসজিদ*, বারাণসীর মসজিদ ও দিল্লিতে একটি অনাড়ম্বর মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর আমল থেকে মোগল স্থাপত্য শিল্পে অবনতির সূচনা হয়। প্রাদেশিক স্থাপত্যগুলিতেও এই দীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেবের মধ্যম পুত্র আজম তাঁর মাতা রাবিয়া-উল্-দুরাণীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের ঔরঙ্গাবাদে তাজমহলের অনুকরণে একটি *সমাধি-সৌধ* নির্মাণ করেন। এটি তাজের ব্যর্থ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু নয়।

ঔরঙ্গজেব

● চিত্রকলা (Painting) :

চিত্রশিল্পের ইতিহাসে মোগল যুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়। দিল্লির সুলতানি শাসকরা চিত্রকলার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, চিত্রকলা ইসলাম-সম্মত নয়। ফিরোজ তুঘলক রাজপ্রাসাদে চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। মোগলদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগের চিত্রশিল্প যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্য, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের চিত্রশিল্পে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সূচনা

মোগল চিত্রকলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (১) মোগল স্থাপত্য শিল্পের মতো মোগল চিত্রকলাও ভারতীয় ও পারসিক শিল্পরীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। (২) মোগল চিত্রকলায় ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে বৌদ্ধ, বহ্জিক, ইরানিয় ও চীনা শিল্পরীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ও সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। (৩) ভারতীয় চিত্রকলার মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কল্পনা, কিন্তু মোগল চিত্রকলার বিষয়বস্তু হল কঠোর বাস্তব। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, সম্রাটের যুদ্ধযাত্রা, শিকার ও বিচারসভা এবং নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৃক্ষ, পশু-পক্ষী ও রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনাবলীকে নিয়ে এই যুগে চিত্রাঙ্কন করা হত। এই চিত্রগুলি ছিল বৃহদায়তন এবং তাতে তুলির কাজ ছিল অসাধারণ। (৪) বাবর ও হুমায়ুন পারসিক শিল্পরীতির অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু আকবরের সময় এই শিল্পরীতি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় চরিত্র লাভ করে। (৫) জাহাঙ্গীরের সময় থেকে চিত্রশিল্পে আঙ্গিক অপেক্ষা বক্তব্যের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বিষয়টির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য প্রকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়। (৬) *পার্সি ব্রাউন* ও অপরাপর কয়েকজন চিত্র-বিশেষজ্ঞ মোগল চিত্রে ইওরোপীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। মোগল দরবারে টমাস রো, হকিন্স প্রমুখ ইওরোপীয় দূতদের উপস্থিতিই নাকি এর কারণ। (৭) মোগল চিত্রশিল্পে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সমন্বয়ের আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে। পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনাবলীর চিত্রায়িত রূপই এর প্রমাণ।

বৈশিষ্ট্য

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুরাগী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রকৃতির ঋতু-বৈচিত্র্য ও তার পরিবর্তিত বিভিন্ন রূপ তাঁর শিল্পী-মনকে গভীরভাবে নাড়া দিত। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ধরে রাখার জন্য তিনি দরবারে বেশ কয়েকজন চিত্রশিল্পী নিয়োগ করেন।

বাবর

হুমায়ুনও চিত্রশিল্পের একজন সমঝদার ছিলেন। রাজ্যচ্যুত অবস্থায় বেশ কিছুদিন তিনি পারস্যে ছিলেন এবং সেখানে মির সৈয়দ আলি ও খাজা আবদুস সামাদ নামে দুই চিত্রশিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁদের দিল্লিতে নিয়ে আসেন। এই দুই চিত্রশিল্পীকে কেন্দ্র করেই মোগল চিত্রকলার বিবর্তন শুরু হয়। বালক আকবর এই দুই শিল্পীর কাছে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করেন।

হুমায়ুন

আকবরের আমলে মোগল চিত্রশিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। আবদুস সামাদের নেতৃত্বে তিনি একটি পৃথক চিত্রশিল্প বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি প্রায় একশ' জন হিন্দু-মুসলিম চিত্রশিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর আমলের প্রধান সতেরোজন চিত্রশিল্পীর মধ্যে তেরোজনই ছিলেন হিন্দু। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দশওয়ান্ত, বসাবন, লাল, কেসু, তারাচাঁদ, জগন্নাথ প্রমুখ। মুসলিম চিত্রশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবদুস সামাদ, সৈয়দ আলি ও ফারুক বেগ। তাঁদের অঙ্কিত চিত্রগুলি ফতেপুর সিক্রি ও অন্যান্য স্থানের সৌধগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ফতেপুর সিক্রির চিত্রশিল্পীদের তিনি 'মনসবদার' বা 'আহ্‌দি' পদে নিয়োগ করে পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের বেতন দেবার ব্যবস্থা করেন। *'চেঙ্গিজনামা', 'জাফরনামা', 'রণমনামা', 'বাবরনামা', 'রামায়ণ'* প্রভৃতি গ্রন্থের সৌন্দর্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রন্থের অভ্যন্তরে বেশ কিছু চিত্রাঙ্কন করা হয়।

আকবর

বিশিষ্ট শিল্প-বিশেষজ্ঞ *আনন্দ কুমারস্বামী* জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে মোগল চিত্র-কলার ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। *স্যার টমাস রো* তাঁকে চিত্রকলার একজন শ্রেষ্ঠ অনুরাগী বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চিত্রকর, দক্ষ চিত্র-বিচারক ও উৎসাহী চিত্র-সংগ্রাহক। চিত্রশিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি উচ্চমূল্যে তাঁদের অঙ্কিত চিত্রাদি কিনে নিতেন। তাঁর আমলের চিত্রশিল্পে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। (১) এ সময়েই মোগল চিত্রশিল্প আত্মনির্ভর ও পরিপক্ক হয়ে ওঠে। চিত্রশিল্পে পারসিক প্রভাবের বিলুপ্তি ঘটিয়ে খাঁটি ভারতীয় ভাব ও রীতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। (২) জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতীয় শিল্পীরা ইওরোপীয় চিত্রকলার সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে ভারতীয় চিত্রকলায় ইওরোপীয় প্রভাব পড়ে—এমনকী খ্রিস্টধর্মের বিষয়বস্তুও মোগল চিত্রশিল্পে স্থান পায়। (৩) ক্ষুদ্রচিত্র (miniature) সম্রাটের খুবই প্রিয় ছিল। এর ফলে এই চিত্রেরও বিকাশ ঘটে। (৪) চিত্রের সঙ্গে চিত্রকরের নামোল্লেখ এ সময় থেকেই শুরু হয়। (৫) জাহাঙ্গীর বন, লতা-পাতা, ফুল, পাখি ও বিভিন্ন নৈসর্গিক চিত্রাদি পছন্দ করতেন এবং তাঁর আমলে এই সব প্রকৃতিবাদী চিত্রের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আমলের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরা হলেন ফারুক বেগ, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ, ওস্তাদ মনসুর, আবুল হাসান প্রমুখ। হিন্দু শিল্পীরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও মনোহর, বিষেন দাস, কেশব, তুলসী প্রমুখ শিল্পীরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। *পার্সি ব্রাউন* বলেন যে, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল শিল্পের আত্মা অবলুপ্ত হয়।

জাহাঙ্গীর

শাহজাহানের মূল আকর্ষণ ছিল স্থাপত্যের দিকে। এ কারণে তাঁর আমলে চিত্রশিল্প অবহেলিত হয় এবং শিল্পীরা রাজানুগত্য থেকে বঞ্চিত হন। তিনি চিত্রশিল্পীদের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস করেন। তাঁর আমলের চিত্রগুলিতে শিল্প অপেক্ষা রঙের আধিক্য ও আড়ম্বর পরিলক্ষিত হয়। কোনও কোনও আমির-ওমরাহ ব্যক্তিগতভাবে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নূরজাহান-ভ্রাতা আসফ খাঁ এবং সম্রাট-পুত্র দারাশিকো। এই যুগের উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পীরা হলেন মির হাসান, অনুপ চিত্রা, চিত্রামণি, সমরকন্দি, মহম্মদ নাদির প্রমুখ।

শাহজাহান

ধর্মীয় কারণে ঔরঙ্গজেব চিত্রশিল্পের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি ভবনের চিত্রগুলি বিনষ্ট করেন। সম্ভবত তিনি বিজাপুরেও বহু চিত্র নষ্ট করেন। এ সত্ত্বেও কৃতবিদ্য চিত্রশিল্পীরা কিন্তু তাঁদের শিল্পচর্চা একেবারে বন্ধ করে দেন নি। এর প্রমাণ হিসেবে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধশিবির, যুদ্ধের দৃশ্যাবলী, শিকাররত ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি চিত্রগুলির কথা বলা যায়।

ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজেব চিত্র-সংস্থা বন্ধ করে দিলে শিল্পীরা লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও গোয়ালিয়রে প্রাদেশিক দরবারগুলিতে আশ্রয় পান। এই যুগে মোগল দরবারের বাইরেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্পের বিকাশ ঘটে। এই যুগে মেবার, অম্বর, বুন্দি, বিকানীর, মালব প্রভৃতি স্থানে *রাজপুত শিল্পকলার* অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শিকারের দৃশ্যকে উপজীব্য করে রেখা ও রঙের বাহারি কাজ ও বর্ণনার খুঁটিনাটি হল রাজপুত শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। যোধপুর ও জয়পুর ছিল এই শিল্পের প্রধান দু'টি কেন্দ্র। পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলেও চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই শিল্পরীতি *'পাহাড়ি শিল্পরীতি'* নামেও পরিচিত। এছাড়া, জম্মু-কাশ্মীরের *গুলার চিত্র*, দক্ষিণ ভারতের *বিজয়নগরী* ও *বিজাপুরী* চিত্রাবলীর নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রাদেশিক শিল্প

● সঙ্গীত (Music) :

মোগল বাদশাহরা সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবর কেবলমাত্র সঙ্গীত পছন্দই করতেন না—তিনি সঙ্গীতের উপযোগী করে কাব্যও রচনা করতেন। কথিত আছে যে, তিনি সঙ্গীত-ধারা সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। হুমায়ুন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত পছন্দ করতেন এবং সপ্তাহে দু'দিন করে তাঁর দরবারে সঙ্গীতের আসর বসত। আকবর ছিলেন একজন মহান সঙ্গীত-প্রেমিক। তাঁর দরবারে হিন্দু, ইরানি, তুরানি, কাশ্মীরী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ৩৬ জন সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত থাকতেন। তিনি প্রতিদিন দরবারে সঙ্গীতের আসর বসাতেন। তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতের তাল, লয়, রাগিণী ভালো বুঝতেন এবং সুন্দর 'নাকাড়া' বাজাতেন। ***আবুল ফজল*** বলছেন যে, সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর এত জ্ঞান ছিল যা শিক্ষণপ্রাপ্ত সঙ্গীতজ্ঞদেরও ছিল না। গোয়ালিয়রের মিঞা তানসেন ছিলেন তাঁর দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। ***আবুল ফজল*** -এর মতে, বিগত এক হাজার বছরে তানসেনের মতো সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি মল্লার, তোড়ি, সরঙ্গ প্রভৃতি রাগ আবিষ্কার করেন। অন্যান্যদের

মধ্যে ছিলেন বাবা রামদাস, হরিদাস স্বামী, মালবরাজ বাজবাহাদুর, বাউজু-বাউরা ও সুরদাস। আকবরের প্রভাবে ও গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের চেষ্টায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বহু রাগ ও রাগিণীর সৃষ্টি হয়। সঙ্গীতরসিক **জাহাঙ্গীর**-এর দরবারে "দিবা-রাত্র সহস্রাধিক গায়ক ও নর্তকী" উপস্থিত থাকত। তিনি নিজেও বহু হিন্দি সঙ্গীত রচনা করেন। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানও সঙ্গীতকারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুহম্মদ সালিহ্ ও তাঁর ভাই বিশিষ্ট হিন্দি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বিকানীরের জগন্নাথ ও জনার্দন ভট্ট তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। সুগায়ক **শাহজাহান** নিজে বহু সঙ্গীত রচনা করেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর দরবারে গায়ক ও নর্তকীদের সমাবেশ ঘটত। *ডঃ যদুনাথ সরকার* বলেন যে, সম্রাটের গলা এত সুমধুর ছিল যে, সাধু-সন্ন্যাসী ও সুফিরা তাঁর গান শুনে আত্মহারা হয়ে যেতেন। রামদাস ও মহাপাত্র ছিলেন তাঁর দরবারের বিশিষ্ট সঙ্গীতকার। **ঔরঙ্গজেব** সর্বপ্রকার সঙ্গীত ও নৃত্যের বিরোধী ছিলেন। তিনি গায়ক ও নর্তকীদের দরবার থেকে বিতাড়িত করেন। এ সত্ত্বেও আমির-ওমরাহরা গোপনে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং রাজপরিবার থেকেও সঙ্গীত নির্বাসিত করা সম্ভব হয় নি। মোগল আমলে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়। সেগুলির মধ্যে *'গীতপ্রকাশ', 'সঙ্গীত কৌমুদী', 'সঙ্গীত সারণী'*, মেবারের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ কুম্ভকর্ণ-রচিত *'সঙ্গীতরাজ'* উল্লেখযোগ্য।

● **সাহিত্য (Literature) :**

সাহিত্য

মোগল বাদশাহরা কেবলমাত্র সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না—তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের দরবারে বহু কৃতবিদ্য কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক স্থান লাভ করেছিলেন। আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায় সুলেখক ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী **বাবর** রচিত *'তুজুক-ই-বাবরী'* বা বাবরের আত্মজীবনী কেবলমাত্র তুর্কি সাহিত্যেই নয়—সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। **হুমায়ুন** শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক তাঁর দরবারে স্থান লাভ করেন। **আকবরের** আমলে আগ্রা ফারসি সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ভ্রাতা সমকালীন ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ফৈজী ছিলেন তাঁর সভাকবি। তাঁর অন্যতম সভাসদ আবদুর রহিম খান খানান একজন কৃতী সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর দরবারের অন্যান্য বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে ছিলেন গাজালি মাশাদি, উরফি শিরাজি, হোসেন নাজিরি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় *মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ব বেদ, লীলাবতী* প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। কয়েকটি গ্রিক ও আরবি গ্রন্থেরও ফারসি অনুবাদ করা হয়। সাহিত্যরসিক **জাহাঙ্গীর** *'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'* নামে তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেন। আবু-তালিব-আমুলি তাঁর সভাকবি ছিলেন। এই যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে মির্জা গিয়াস বেগ, নাকিব খাঁ ও নিয়ামৎউল্লা-র নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক **শাহজাহানের** সভাকবি ছিলেন আবু তালিব কালিম। আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত সম্রাটপুত্র

দারা-র পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিষদ, গীতা, অথর্ব বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। **ঔরঙ্গজেব** সাহিত্যচর্চার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় *'ফতোয়া-ই-আলমগীরী'* নামে ফারসি ভাষায় মুসলিম আইন-সংগ্রহ সংকলিত হয়। এই যুগে বহু ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয়। বাবরের আত্মজীবনী ব্যতীত বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম রচিত *'হুমায়ুননামা'* ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। **আকবরের** সভাসদ আবুল ফজল রচিত *'আকবরনামা'* ও *'আইন-ই-আকবরী'*, বদাউনি-রচিত *'মুন্তাখাব-উল-তারিখ'*, নিজামউদ্দিনের *'তবাকৎ-ই-আকবরী'*, আহম্মদ বক্‌শীর রচিত *'তাবাকৎ-ই-আকবরী'*, ফেরিস্তার *'তারিখ-ই-ফেরিস্তা'*, ফৈজী সর্‌হিন্দী রচিত *'আকবরনামা'* আকবরের রাজত্বকালের মূল্যবান ইতিহাস-গ্রন্থ। *'মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী'* ও *'ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী'* **জাহাঙ্গীরের** রাজত্বকালের মূল্যবান ইতিহাস। আবদুল হামিদ লাহোরি রচিত *'পাদশাহানামা'* ও ইনায়েৎ খাঁ রচিত *'শাহজাহাননামা'* **শাহজাহানের** আমলে রচিত হয়। **ঔরঙ্গজেব** ইতিহাস-চর্চার বিরোধী হলেও তাঁর আমলে কাফি খাঁ *'মুন্তাখাব-উল-লুবাব্'*, মির্জা মহম্মদ কাজিম *'আলমগীর-নামা'*, মহম্মদ সাকি *'মাসির-ই-আলমগীরী'*, ঈশ্বর দাস *'ফুতুহাৎ-ই-আলমগীরী'*, ভীমসেন *'নুস্‌কা-ই-দিলখুসা'* প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেন।

ইতিহাস-রচনা

মোগল যুগে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে **গুরুমুখি, হিন্দি, উর্দু,** ওড়িয়া, মারাঠি, বাংলা, গুজরাটি, অহমিয়া, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলেগু, কানাড়া প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। আকবরের আমলের শ্রেষ্ঠ হিন্দি কবি তুলসীদাস *'রামচরিতমানস'* কাব্য রচনা করেন। আকবরের সভাসদ বীরবল, ভগবান দাস, টোডরমল, মানসিংহ, আবদুর রহিম খান খানান **হিন্দি** ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। অন্ধ কবি সুরদাস এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। **উর্দু** সাহিত্যে মির্জা-জান-ই-জানান, মহম্মদ কুলি ও মির তাকি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। **গুজরাটি** সাহিত্যে বিজয় সেন ও শ্রীধর, **অহমিয়া** সাহিত্যে শঙ্কর দেব ও মাধব দেব, **ওড়িয়া** সাহিত্যে উপেন্দ্র ভঞ্জ, দিনকর দাস, অভিমন্যু সামন্ত প্রমুখ সাহিত্যিকরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন। গুরু অর্জুন, ভাই গুরুদাস, গুরু গোবিন্দ সিংহ **গুরুমুখি** ভাষায় ভক্তি-পদ রচনা করেন। তুকারাম ও রামদাসের রচনায় **মারাঠি** সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে। কাশীরাম দাসের *'মহাভারত'*, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের *'চণ্ডীমঙ্গল'*, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের *'অন্নদামঙ্গল'* ও *'বিদ্যাসুন্দর'* কাব্য, রামপ্রসাদ সেনের শাক্তগীতি এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থ **বাংলা** সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করে। বিশিষ্ট বৈষ্ণব গীতিকার মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, জ্ঞানদাস প্রমুখের রচনা এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের *'চৈতন্যচরিতামৃত'*, জয়ানন্দের *'চৈতন্যমঙ্গল'*, বৃন্দাবন দাসের *'চৈতন্যভাগবত'*, ত্রিলোচন দাসের *'চৈতন্যমঙ্গল'*, নরহরি চক্রবর্তীর *'ভক্তি রত্নাকর'* বাংলা সাহিত্যকে নতুন ঐশ্বর্যে ভূষিত করে।

আঞ্চলিক সাহিত্য